রূপসী বসন্তিনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.02.24 00:59:38 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

রূপসী বিহঙ্গিনী

ঈশ্বর তুমি বলো। হে ঈশ্বর। শেষ প্রশ্ন করলে সুচন্দ্রা।

খুব ভোরবেলা। শেষরাত্রির শেষ লগ্ন—ভোরবেলাও ঠিক বলা চলে না। চারটে বাজে-বাজে। অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করলেও আকাশের রঙ তখনও গাঢ়, তারা ফুটে রয়েছে। দুটি চারটি নিভেছে। পূর্বদিকে শুকতারা এখনও খুব উজ্জ্বল। পাখীরা ঘুম ভেঙ্গে তাদের সেই প্রথম কল্‌কলে ডাক এখনও ডেকে ওঠেনি। আকাশে চাঁদ নেই। পক্ষটা শুক্লপক্ষ। পৃথিবীতে এ সময় আশ্চর্য স্তব্ধতা।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জেলখানাটা জেগে উঠল।

জেলখানার অফিস-ঘরে আলো জ্বলছে। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে মৃদু কণ্ঠের। জেলখানার গেটে পর পর দুটো ফটক থাকে; একটা ভিতরের দিকে, একটা বাইরের দিকে। ভিতরের দিকে ফটকটার লোহার পাটী এবং রড দিয়ে তৈরি পাল্লা দুটোর একটার গায়ে একটা ছোট দরজা আছে। সেটা খুলে গেছে। আপিস ঘর থেকে একজন সেনাট্রি ভিতরে ঢুকে গেল। ভারী মজবুত বুট পরা বলিষ্ঠ পায়ের শব্দ বাজতে বাজতে দূরে চলে গেল ভিতরের দিকে।

ওয়ার্ডগুলি তালা-বন্ধ। বাইরে সেন্‌ট্রি ঘুরছে। রোজই ঘোরে। কিন্তু আজ যেন তার মধ্যে একটা বাড়তি কিছু বা নতুন কিছু বা অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। ওয়ার্ডের ভিতরে কয়েদীদের জেগে ওঠার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এত ভোরে তারা জাগে না। শেষরাতের ঘুমে মৌজ আছে। সে ঘুমও তাদের ভেঙে গেছে। মনের ভিতর থেকে কে যেন খোঁচা দিয়ে ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে দিয়েছে।

আজ একজনের ফাঁসী হবে। কাল সন্ধ্যেবেলাতেই কথাটা কেমন করে কানাকানি ফিসফাসের মধ্য দিয়ে সকলে জেনে গেছে।

ফাঁসী আজকাল কম হয়। খুন কমেনি, কিন্তু ফাঁসী কমেছে। বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকারটিকে বড় একটা নাড়তে চান না। জুরীদের কাছে বেনিফিট অব ডাউট। তবুও মধ্যে মধ্যে নিরুপায় হতে হয় জুরীদের ; জজের হাত শক্ত হয়ে ওঠে। ফাঁসী হয়। এমন ক্ষেত্রে একটা অস্বস্তি, গ্রীষ্ম-বর্ষার গুমোটের মত শীতকালের শেষ-রাত্রির কনকনে হিমের মত সমস্ত জেলখানা জুড়ে সঞ্চারিত হয়। ফাঁসী কবে হবে—তার তারিখ, কর্তৃপক্ষ গোপনই রাখেন—গোপন রাখাই নিয়ম, কিন্তু বিচিত্রভাবে সারা জেলখানা আগের দিন সন্ধ্যায় ঠিক জেনে যায় যে, কাল ভোরে ফাঁসী হবে খুনি আসামীটির! এবং সেদিন ভোরবেলা ঠিক তারা জেগে ওঠে। তালা-বন্ধ ওয়ার্ডের মধ্যে তারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে জেগে থাকে। বাইরে যথাসময়ে সেনাট্রিরা চলাফেরা করে—কিন্তু তার মধ্যে থেকেই তারা বুঝতে পারে, সেনাট্রিদের বুটের শব্দের মধ্যে যেন তাল কেটে যাচ্ছে। ঠিক যেন তালে তালে লেফট্ রাইট হচ্ছে না। কখনও আবার কাঁকরের উপর বুট শুদ্ধ পা যেন ফসকে টলে যাচ্ছে। আজকের উৎকণ্ঠা অস্বস্তির জন্য যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ফাঁসীর আসামী আজ একজন মেয়ে। রূপসী মেয়ে, যুবতী মেয়ে। সম্ভবতঃ। কারণ এরা তাকে চোখে কেউ দেখেনি—সে থাকে জেনানা ফটকে—ফিমেল ওয়ার্ডে। খুন করেও 'এ' ক্লাসের আসামী। একটা স্বতন্ত্র ঘরে থাকে। গোটা বিচারের কালটা নাকি সে দামী দামী কাপড়-জামা পরেছে। তার চাল-চলন সম্পর্কে হাজার গল্প তৈরী হয়েছে কয়েদীদের মধ্যে। কেউ বলেনি, যে দেখেছে তাকে, তবু ধারণা—সে রূপসী, সে যুবতী।

মেয়েটি রূপসী কি রূপসী নয়, যুবতী কি যুবতী নয়—এ নিয়ে প্রশ্নই নেই। না দেখেও এটা সকলের কাছে স্বীকৃত সত্য। রূপ যৌবন—তার সঙ্গে একটি খ্যাতি একসঙ্গে মিলে তাকে কাহিনীর কন্যার মত লালসাময়ী করে তুলেছে। লক্ষহীরা গল্পের নায়িকার মত। লক্ষহীরার মত সেই মেয়েটিও বেশ্যা। লালসার মূল উৎস বোধহয় সেইখানে। এরপর মেয়েটি খ্যাতিমতী গাইয়ে এবং নাচিয়ে। লালসার জল এখানে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। প্রশ্রয় পেয়েছে, পুষ্ট হয়েছে। এরপর মেয়েটির নামটি লক্ষহীরা নামের মতই বিচিত্রভাবে বর্ণোজ্জ্বল এবং মিষ্ট।

নাম তার বিহঙ্গিনী। শুধু বিহঙ্গিনী নয়, পরে ভক্তের দল একটি বিশেষণও তাকে ভূষিত করেছিল। বলত—রূপসী বিহঙ্গিনী। সুন্দর রূপ এবং সুন্দর কণ্ঠ—একসঙ্গে একত্রে এক নারীদেহে বাসা বেঁধেছে লালসা এখানে যেন অকস্মাৎ উছলে—কানা ছাপিয়ে উপচে পড়েছে। ময়না-টিয়া-কোয়েল-পাপিয়া 'বউ কথা কও, পর্যন্ত যত মিষ্টি ডাকিয়ে পাখী যেন একজোট হয়ে তার মধ্যে একটি নারীরূপ নিয়েছে বলে তাদের মনে হয়। সুতরাং জীবনোল্লাস উপচে পড়ে। উপচে পড়ার মধ্যে অপচয়ের অর্থ আছে। কিন্তু অপচয়েও বিহঙ্গিনীর লালসার আকর্ষণ একবিন্দু কমে না। সেকালে বালকদের গল্পের মধুদাদার অক্ষয় দধিভাণ্ডটির মত উল্টে পড়েও কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। বিহঙ্গিনী যার নাম তার চলনে আছে ময়ূরীর নাচের ছন্দ (ময়ূরের বলাই উচিত, তবু লোকেরা বলতে চায় ময়ূরী) তার কথায় কণ্ঠস্বরে আছে কোকিলের সুর, 'বউ কথা কও' পাখীর গান, এবং বেশভূষা প্রসাধন সমেত তার চেহারার মধ্যে আছে হলুদ-মনি পাখীর মতই অপরূপ রূপ। রেকর্ডে বিহঙ্গিনী সেনের একখানা বিখ্যাত গান আছে 'এলানো অলক ভুবন ভুলানো—কবরী বেঁধো না সখী'। তা থেকে মনে হয় রূপসী বিহঙ্গিনীর পিঠের উপরে পড়ে আছে একরাশি শ্যাম্পুকরা রেশমের মত কালো চুল। এইখানে আর কোন পাখীর কথা মনে হয় না। মনে হয় একটি মেয়েকে। একটি অপরূপ লালসাময়ী মেয়ে। নাম তার রূপসী বিহঙ্গিনী।

এই বিহঙ্গিনীর আজ ফাঁসী হবে।

বিহঙ্গিনী খুন করেছে—তার গুরুকে। ক্ষুর দিয়ে গলার নলীটাকে কেটে দিয়েছে। সমস্ত-শরীর শিউরে ওঠে। মনের মধ্যে অন্তরাত্মা যেন কুঁকড়ে যেতে চায়। কিন্তু তবু বিহঙ্গিনীর প্রতি মোহ ঘোচে না।

মোহ ঘোচা দূরে থাক, মোহ বাড়ে। গুরু একজন সন্ন্যাসী। অল্প বয়স। কিন্তু সন্ন্যাসীদের সে-কাল তো ঘুচে গেছে। কনে-দেখা-আলোয় যে কোন মেয়েকে তুলে ধ'রে আজও দেখানো যায় এবং তাকে সুন্দরও দেখায় এ-কথা সত্যি, কিন্তু কনে-দেখা-আলোর

কালটা নিশ্চিতরূপে চলে গেছে। এদেশে এককালে গুরুপ্রসাদী অধিকারের অধিকারী ছিল গুরুরা। সন্ন্যাসীরা তে মঠ খুলে মহান্ত-গিরির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে-কাল গেছে—কিন্তু এরা এখনও আছে। এ লোকটা একসঙ্গে সন্ন্যাসী এবং গুরু। তার উপর বয়সে নবীন। সুতরাং এই নবীন গুরু সম্পর্কে কারুরই একটা সহানুভূতি ছিল না বরং সন্দেহই ছিল।

বিহঙ্গিনীর বাড়ীতে গুরু এসেছিলেন—অধিষ্ঠান করেছিলেন। বিহঙ্গিনীকে পাপমুক্ত করতে এসেছিলেন; চেয়েছিলেন স্বর্গের স্পাইরাল সিঁড়িটার ধাপের কাছে এনে সিঁড়ি ধরিয়ে দিতে। গুরু কথা বলছিলেন—বিহঙ্গিনী শুনছিল। এই পর্যন্ত দেখেছে অন্য লোকে। তারপর কি হয়েছে, কি কি ঘটেছে, তা এক বিহঙ্গিনী ছাড়া কেউ জানে না।

বিহঙ্গিনী বলেছে—আমি শোধ নিয়েছি।

—শোধ? কিসের শোধ?

—সে আমি বলব না।

—কি করেছিল তোমার?

—বলব না! বললেও কেউ বুঝবে না।

—বুঝুক না-বুঝুক—বল তুমি।

—না।

—'না' বললে তোমার ফাঁসী হয়ে যাবে।

—যাক। মরণে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

—তোমার উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল?

—না।

—তবে কি করেছিল?

—কি করবে? কিছুই না।

—কি হয়েছিল, বল?

—আমি গিয়েছিলুম গুরুর আশ্রমে। সন্ধ্যেবেলা থেকে নাম-গান হল। তারপর উনি চোখ বুজলেন। নাম ডাকতে লাগল।

আমার রাগ হল। রাগটা পোষা ছিল। জীবনের বত রাগ—সব রাগটা একসঙ্গে ফুঁসে উঠল। আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে—একখানা ক্ষুর ছিল ওপাশের টিপয়ের উপর, সেখানাকে নিয়ে এলাম। তারপর শক্ত হাতে ধরে,—চিৎ হয়ে শুয়েছিল গুরু—একেবারে নলীর ওধারে খপ করে বসিয়ে দিয়ে প্রাণপণ জোর দিয়ে কোলের দিকে টেনে আনলাম। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হল। গুরু খানিকটা চমকে একবার চোখ মেলে চাইলে—তারপরই···ব্যস। বার কয়েক হাত-পা ছুঁড়লে—গলগল করে রক্ত বের হল—চোখ দুটো উল্টে গেল।

—তারপর ?

—আর কি ? খুব আনন্দ হল আমার।

—খুব আনন্দ হল তোমার ?

—হ্যাঁ।

—কেন ? আনন্দ হল কেন ?

—মনে হল—শোধ নিয়েছি।

—কিসের শোধ ? কি করেছিল তোমার ?

—কিছুই না। বরং আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দিয়েছিল। আর কি করবে ? ওকে দেখলেই আমার সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠত। শোধ নিতে ইচ্ছে করত।

হ্যাঁ হ্যাঁ তা বুঝলাম, কিন্তু শোধটা কিসের ? ক্ষতিটা কি করেছিল তোমার সে ?

—তা জানি না। তবে ইচ্ছে হত।

—আচ্ছা—তোমাকে একলা ঘরে পেয়ে তোমার ওপর—

মাঝখানেই বলে উঠেছিল বিহঙ্গিনী—না-না সে ধরনের মানুষই ছিল না লোকটি।

তারপর আপন মনেই বলে উঠেছিল দূর—দূর।

দুটো 'দূর্' শব্দকে বড় কাছাকাছি এনে জোড়া লাগিয়ে উচ্চারণ করেছিল, তাতে অর্থের মধ্যে নিহত তাচ্ছিল্যের ব্যঞ্জনাটা আশ্চর্য সহজ স্বাচ্ছন্দে প্রকাশ পেয়েছিল। কোন অবিশ্বাস উঁকি মারবারও অবকাশ পায়নি, কোন প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়াবার স্থান পায়নি।

নিচের আদালত থেকে হাইকোর্টের দায়রা পর্যন্ত এক কথা বলেছে। খাস কলকাতার অভিজাত দেহবিলাস পল্লীর ঘটনা; বিচার হয়েছে হাইকোর্টে। নাম-করা সুবিচারক বিচারপতি এবং জুরীরাও বিশিষ্ট-জন। এ ছাড়াও তদবিরের জন্য বিহঙ্গিনীর রূপমুগ্ধ গুণমুগ্ধ ব্যক্তির অভাব হয়নি। তারা নিজেরা এদিকে এসে ডিফেন্স চালিয়েছে। এদের মধ্যে ব্যারিস্টার এ্যাডভোকেটও ছিল—তারা আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করেছে।

সকলেই চেষ্টা করেছিল, একটা কথা বলবার জন্য।

—শুধু বলুন, যা আমি করেছি—আত্মরক্ষার জন্য।

বিহঙ্গিনী প্রশ্ন করেছে—যদি বলে—ও কি করেছিল?—তখন কি করব?

—চুপ করে থাকবেন। কোন কথা বলবেন না। মুখ নামিয়ে থাকবেন। আর একটা কথা, আমি শোধ নিয়েছি' এই কথাটা যেন বলবেন না।

—বলব না?

—না। কারণ এরও তো কোন মানে হয় না। বলছেন—শোধ নিয়েছি। কিন্তু কিসের শোধ? বলুন আপনিই বলুন কিসের শোধ?

বিহঙ্গিনী ভাল করে ভেবে বলেছিল—তা জানি না।

—জানেন না তো বলবেন কেন?

—ওকে দেখলেই যেন আক্রোশ অনুভব করতাম।

সে তো একই কথা। কেন আক্রোশ অনুভব করতেন? কারণটা কি?

চুপ করে থেকেছিল বিহঙ্গিনী। নিজের মনের আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়িয়েও কোন কারণকে আবিষ্কার করতে পারেনি।

ব্যারিস্টার পরামর্শ দিয়েছিল—এই কথা দুটো—আসলে দুটোই এক কথা—বলবেন না।

—ওই যে জিজ্ঞাসা করছে—কেন করলে এ কাজ? কি বলব—উত্তরে—?

—এ কাজ আমি করিনি—এই বলাই ঠিক। তাই বলতে চেষ্টা করবেন। নেহাত না পারলে বলবেন—যা করেছি আমি আত্মরক্ষার জন্য করেছি। তারপর একেবারে চুপ করে যাবেন। ব্যস্।

www.boiRboi.blogspot.com

বিহঙ্গিনী ব্যারিস্টারের উপদেশ মত চলতে, কথাবার্তা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনক্রমেই সঙ্গতি রেখে কথা বলে মিথ্যাকে সত্য করে তোলা দূরে থাক—সত্যকে এতটুকু অপ্রকাশ রাখতে পারেনি। ঠিক সেই একই কথাগুলি অবিকল এক ভাবে বলে ফেলেছে। বলে ফেলে—আশ্চর্য এক উদাস ভঙ্গি এবং সেই এক বিস্ময়-অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। হয়তো বা নিজেই ওই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছে নিজের কাছে।—শোধই বা কিসের? আক্রোশইবা কেন?

এরপর মস্তিষ্ক-বিকৃতির অজুহাত খাড়া করবার চেষ্টা করেছিল ব্যারিস্টার। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধারালো সন্ধানী পদ্ধতির মুখে সে অজুহাত দাঁড়াতে পারেনি। ভেঙে পড়েছিল। তারপর—জুরী বিচারক কেউই তাকে করুণা করবার কোন হেতু পাননি। মামলার অভিযোগের বিবরণের মধ্যে ঘটনাটা এমনই ভয়ালভাবে রক্তাক্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েও তাঁরা ক্ষান্ত থাকতে পারেননি। একটি সুন্দরী খ্যাতিমতী কলাবতী মেয়েকে মৃত্যু পর্যন্ত ফাঁসীর দড়ির ফাঁস গলাতে পরিয়ে ঝুলিয়ে দেবার আদেশ ছাড়া আর কোন দণ্ডাদেশ দিয়ে অব্যাহতি পাননি। দেবার কল্পনা মনের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়েও সভয়ে মুখ লুকিয়েছিল।

গুণী কলাবতী মেয়েটিকে পিশাচী মনে হয়েছে।

বিচারক তাঁর রায়ের মধ্যে লিখেছেন—'এমন ঘটনা-সংস্থানে সমস্ত বিবেচনা করে একমাত্র চরম দণ্ড—মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোন দণ্ড দেবার কথা মনে করতেও বিবেক তিরস্কার করে। তার অন্তরালে করুণাময় ঈশ্বরেরও ভ্রূকুটি যেন দেখতে পাই।

'সমস্ত সংঘটনাটির মধ্যে এক বিরল জীবনসত্য আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং বিচারকের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন ও রূঢ়।

আসামীটি একটি নারী! যে নারী জননী, যে নারী জায়া। নারী-জীবন নারী-মনকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সমাজ তাকে সযত্নে গড়ে তুলতে চেয়েছে জায়া ও জননী-রূপিনী নারী রূপে! তাকে সম্ভ্রম করতে চেয়েছে, পূজা করতে চেয়েছে, এবং করেছেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নারীর মধ্যে শুধু জায়া বা জননীই নেই, তার মধ্যে ছদ্মবেশে—হয়তো বা নিজেরও অগোচর—রয়েছে অতিনিষ্ঠুরা পিশাচী। সর্বাপেক্ষা আশঙ্কা ও অনুতাপের কথা এই যে, পিশাচীর পিশাচীত্ব অবস্থান করে তার অন্তরে। বাইরে তার কোন লক্ষণ নেই বা চিহ্ন নেই। বাইরে সে নারী—। নারী স্বাভাবিক-ভাবেই তার দেহ দিয়ে পুরুষকে আকর্ষণ করে। তার যৌবন রূপ এ ক্ষেত্রে অমোঘ। তার উপরে এই নারী সুন্দরী এবং যৌবন প্রান্তে এসেও যুবতী—তার উপর প্রসাধন-নিপুণা। পেশায় দেহ-ব্যবসায়িনী! আক্ষেপের কথা এই যে, মেয়েটি সঙ্গীত এবং অভিনয়ে সুনিপুণা; যার জন্য এই নারী সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠেছে মানুষ ও সমাজের পক্ষে। একে তুলনা করা যায় সেই সাপের সঙ্গে—সে সাপ বা সাপিনী দেখতে অবিকল পুষ্পমাল্যের মত কিন্তু তীব্রতম বিষাক্ত। পুরুষ মোহগ্রস্ত হয়ে গলায় পরে—নাগিনী তার স্বভাবে জাগ্রত হয়ে তার বক্ষে দংশন করে। সমাজ ও সৃষ্টির কল্যাণে এদের বাঁচবার অধিকার নেই।—

সব শেষে 'ঈশ্বরে'র দোহাই দিয়েছেন। দোহাই নয়—বলেছেন, সমস্ত ঘটনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আসামী অস্বীকার করতে চেষ্টা করেও সত্যকে গোপন করতে পারেনি। সুতরাং—

আজ ছ'মাসেরও বেশি সে জেলখানায় রয়েছে। বিচারাধীন হিসেবে ছিল পাঁচ মাস—বিচার হতে লেগেছে মাত্র তিন দিন। সাক্ষী বেশি ছিল না; প্রয়োজন হয়নি—মেয়েটিই একরকম সব বলে গেছে। সাধারণ জীবন প্রগল্‌ভা অভিনয়-নিপুণা এবং তীক্ষ্ণভাষিণী বিহঙ্গিনী, বিচারের সময় বিচিত্রভাবে বিহ্বল হয়ে বুলির কথাগুলি সব ভুলে গিয়েছিল।

ছ'টা মাস তার সম্পর্কে কত কথাই না এই বিশাল জেলখানার কয়েক হাজার কয়েদীর মধ্যে প্রচার হয়েছে। নিত্য প্রতিদিন—একটা বা দুটো নতুন কথা।

www.boiRboi.blogspot.com

—কাল রাত্রে নাকি কেঁদেছে।

কেঁদেছে?

—হ্যাঁ। চোখের জলে একেবারে ভেসে গেছে।

যে শোনে তার মনটা উদাস হয়ে যায়।—কেন, কাঁদলে কেন? ও হয়তো খুন করেনি।

—না—না। খুন ও-ই করেছে। জেনানা ফটকের সিপাহী বললে, যে তাকে বলেছে ওদের মেট—। সেই জুবেদা—।

—ও। তবে? অনুতাপ?

—হবে।

—কোনদিন গুজব রটেছে—কাল সারারাত্রি গান করেছে আপন মনে। আঃ—সে মাইরী কি গান! আরে বাপরে! একেবারে কলেজা খান খান করে দেয়।

—শ্যামা সঙ্গীত না কেত্তন?

—দূর্ দূর্! ধার মাড়ায় না।

—তবে?

—শুনলাম গজ্‌ল সে একদম খাস উর্দু। সেঁইয়া—বনে—। জানালার ধারে বসে—আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে—সে নাকি—এক্কেরে হুঁশ হারিয়ে গান।

শ্রোতা সমাঝদারী ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলেছে—মস্ত বড় গাইয়ে যে। জাত বাঈজী একেই বলে। বুঝলে না। শালা ঘাড়ের উপর খুনের দায়—মাথার উপর ফাঁসীর দড়ির ফাঁস—আর আকাশে চাঁদ দেখে গজ্‌ল গেয়ে দিলে! মায়াবিনী—মোহিনী বলে না—তাই!

—ইয়া! আরে তা নইলে কি এমনি ক'রে নলীতে ক্ষুর চালিয়ে এমন তাজা জোয়ানের গলাটা ফাঁক ক'রে দিতে পারে?

—কপালে লেখা থাকলে সাপে খায়, বাঘে খায় দেখা হলে।

'সাপের লেখা বাঘের দেখা।' আর এ শালা মোহিনী মন্তরে ভুলিয়ে টেনে এনে—মেরে ফেলা।

—হ্যাঁ। মন্ত্র-টন্ত্র না জানলে এ কেউ পারে ?

—হ্যাঁ। মানুষ হলে পারে না। মায়াবিনী রাক্ষসী কি ওই রকম কিছু হবে।

—দেখো তুমি, ফাঁসী হবে না ওর। জজ্‌জুরী সবাইকে ভুলিয়ে দেবে মন্ত্র পড়ে। দেখো। আমি বলে রাখলাম।

গোটা জেলখানায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সেদিন হাজারটা মায়াবিনী ডাইনীর গল্প হয়। দেখো। আমি বলে রাখলাম।

সেই অনেক কাল আগের সেই ডাকিনীদের কথা মনে পড়ে যায়। সেই পূর্ণিমার রাত্রে আকাশ পথের শব্দ উঠেছিল—একটা কালো মত কিছু যেন উল্কাবেগে ছুটে চলছিল। এক গুণীন তাকে মন্ত্রবলে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলে। দেখা গেল একটা কাঁচা তাজা মূল শুদ্ধ বটগাছ। তারা দুটো ডালের জোড়ের মধ্যে বসে এক আশ্চর্য রূপসী মেয়ে, একেবারে উলঙ্গ সারা অঙ্গে একফালি ন্যাকড়া এমন কি চাবকীর বাঁধনটুকু পর্যন্ত নেই। গোলাপফুলের মত বর্ণ—যেন মাখনের মত নরম—আর এই একপিঠ কালো চুল, তেল নাই চুলে, কালো মেঘের মতো রুক্ষো কালো চুল পিঠ ঢেকে মুখ ঘিরে পড়ে আছে। নেমেই দু'হাতে মুখ ঢাকলে। লজ্জায়। এতগুলি পুরুষের সম্মুখে উলঙ্গ যুবতী মেয়ে।

শ্রোতারা নির্বাক বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে শোনে।

গল্পের শেষে ওই মায়াবিনী বিচিত্র উপায়ে—সেই গুণীদের শরীরের চামড়া আপনা-আপনি যেন কোন অদৃশ্য হাতে নিষ্ঠুরতম টানে টানে ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেয় এবং এলোকেশী উলঙ্গ ডাকিনী সেই গাছে চড়ে মন্ত্র হেঁকে গাছটাকে শূন্যপথে তুলে চলে যায় কোন নিরুদ্দেশে তার স্বেচ্ছাবিহারের পথে।

এমনকি 'এ' ক্লাস কয়েদীদের ওয়ার্ডে উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত

ইয়োরোপীয় দীক্ষায় দীক্ষিত, তহবিল-তছরুপের জন্য দণ্ডিত সাহেব মানুষটির কানে এই গানের কথা যায়। সে-ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। ভাবে—হ্যাঁ, এরা সব পারে।

Woman can do anything A-n-y thing.

ইতিহাসের পাতায় মন চলে যায়।

আনারকলিকে ঘরের দরজা-জানালা গেঁথে বন্ধ করে মেরেছিল। ফৈজীকেও তাই। কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে খাওয়ানোর কথাও আছে। সমস্ত জেলখানার সব কয়েদীই একমত হয়ে যায়।

আবার হয়তো তারই পরের দিন শোনা যায়—কাল রাত্রে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে কতক্ষণ যে বসেছিল তার ঠিক নেই। সব শেষে একবার চীৎকার করে 'মা' বলে সে যাকে বলে প্রাণ ফাটিয়ে ডেকেছিল। সে ডাক যে শুনেছে তারও প্রাণখানা বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে।

যে বা যারা শোনে—তারাই বলে ওঠে—আ—হা!

সেই সঙ্গে সারা জেলখানায় ধ্বনি ওঠে—আ—হা!

একদিন জেল-গেটে হাজতী আসামী ডাকাতি কেসের লোক তুলে দিয়ে এক ওয়ার্ডের মেট ফিরে এসে বলেছিল—মেয়েটার খসখসে চুলে আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধ! ঠিক সেই সময়টা মেয়েটিও যাচ্ছিল—বিচারের জন্য হাইকোর্টে। মেট একটু দূর থেকে সেই গন্ধ পেয়েছে। মেটটা বলে—অপূর্ব। সারা দিনরাত সেই গন্ধে মাতাল হয়ে রইল জেলখানা।

মেয়েটি তখনও আণ্ডার-ট্রায়াল প্রিজনার। ক্লাস পেয়েছিল—'এ' ক্লাস। বেগ পেতে হয়নি। বিহঙ্গিনী নামটিই ছিল যথেষ্ট। থিয়েটারের বিবর্ণ পোস্টারে রূপসী বিহঙ্গিনী নামটা আজও খুঁজে পাওয়া যাবে! তার গানের রেকর্ড বাজারে বিক্রী হয়। তাতেও লেখা আছে সুচন্দ্রা দেবী ওরফে বিহঙ্গিনী। গান শেষ হলে কয়েকটা রেকর্ডে আছে গায়িকা বলছে—আমি রূপসী বিহঙ্গিনী। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে তার নামের ফাইল আছে তাতেও ওর বিহঙ্গিনী নামটা আছে।

গায়ে মাখার সাবান—মাথার চুলে দেবার তেলের বিজ্ঞাপনে ওর ছবি এবং নাম দুইই ছাপা হয়েছে কয়েকটা বছর ধরে।

বিহঙ্গিনী এমন নৃশংসভাবে খুন করেছে একথা বিশ্বাস করতে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। সরাসরি না হলেও প্রকারান্তরে বিহঙ্গিনী একথা স্বীকার করেছে; অস্বীকার করার সব উদ্যম তার প্রচণ্ড বর্ষণের মুখে কাঁচা মাটির দেওয়ালের মত ধ্বসে পড়েছে—তবু তারা বলে—সত্য হলে—টেম্‌পোরারী ইনস্যানিটি। অথবা—।

অথবা কি—তা তারা খুঁজে পায় না।

আজও তাদের কয়েকজন অন্তত জেল-গেটে আসবে। আসবে মৃতদেহটা নেবার জন্যে।

ক'দিন আগেও দু'জন বন্ধু এসে দেখা ক'রে গেছে। বিশিষ্ট ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে গেছে—তোমার কোন ইচ্ছে থাকে তো বল।

বিহঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি, মাটির দিকে চোখ রেখে কথা বলেছিল। মেয়েটি কিন্তু বিচিত্র, বলেছিল—একটা খুব ভাল সেণ্ট পাঠিয়ে দিয়ো। শুনেছি ফাঁসীর দিন ভোরবেলা চান করতে হবে। নতুন কাপড়-জামা দেবে পরতে! বাইরের কাপড়-জামা পরতে দেবে না, জেলের পোষাক পরতে হবে। তা হোক। চান করে সেণ্ট মাখব। আর—আর এক শিশি শ্যাম্পুও দিয়ো।

—আর কিছু? প্রশ্ন করেও প্রশ্নকর্তা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল।

উত্তরে বিহঙ্গিনী ভুরু কুঁচকে প্রশ্নটাকেই উচ্চারণ করেছিল—আর কিছু?

আর কি?

আর কি, খুঁজে পায়নি। খুঁজতে খুঁজতে সে যেন নিজেই হারিয়ে গিয়েছিল নিজের কাছে। একটা বোবা বর্ণহীন হয়তো-বা স্থান কালহীন কোন একটা প্রান্তর অথবা অতল কোন নিরুদ্দেশের অথৈ বিস্তৃতির সামনে এসে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, বন্ধু তাকে ডেকেছিল—সুচন্দ্রা!

বিহঙ্গিনী মেয়েটির স্টেজের নাম। ওর প্রথম নাম সুচন্দ্রা। বিহঙ্গিনী নামটা ওকে দিয়েছিল ওর একজন অজ্ঞাত ভক্ত। একদা ডাকযোগে একখানি চিঠি এসেছিল। কবিতার চিঠি। লেখকের নাম ছিল না। তাতেই ছিল—

www.boiRboi.blogspot.com

ফুল নও, তারা নও, তুমি সখী মানবীও নও—
সোনার মাধুরী অঙ্গে, কণ্ঠে তব একসঙ্গে বাজে
সোনার সেতার আর রৌপ্যঘণ্টা ধ্বনির আবহ
তুমি সখী স্বর্গ বিহঙ্গিনী। পথ ভুলে মর্ত্য মাঝে—
এসে স্বর্গের শুধুই সুখে আর ফেরো নাই।

সে কবিতায় অনেক কথা ছিল এবং দৈর্ঘ্যেও ছিল অনেকটা সুদীর্ঘ। রঙ্গমঞ্চের অন্য অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেসরা অনেক হাসাহাসি করেছিল। কর্তারাও হেসেছিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই বিহঙ্গিনী নামটি চালু করে দিয়েছিল বিজ্ঞাপন মারফত। সারা কলকাতার বড় বড় বাড়ির দেওয়ালে ডিমাই কাগজের আধখানা মাপের একখানা বিজ্ঞাপন মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল তারা। তারপর এমনি হল যে সুচন্দ্রার নামটাই বাতিল হল বাইরে। সে হয়ে গেল বিহঙ্গিনী।

থাক সে-সব কথা।

মৃত্যু বিহঙ্গিনীর মাথার উপর অদৃশ্যলোকে বাজপাখীর মত পাক খাচ্ছে। বোধ করি ওই সম্পর্কে সচেতনতাই তাকে এমন অন্যমনস্ক ক'রে দিয়েছিল—অথবা বলা যায়—কোন অতল নিরুদ্দেশের অথৈ বিস্তৃতির কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

সে অন্যমনস্কতার মধ্যে থেকে তার মনকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যই তার বন্ধু তাকে ডেকেছিল—সুচন্দ্রা।

একটু চমকে উঠে বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গিনীই বলব এখন) সাড়া দিয়েছিল—এ্যাঁ।

—বল, আর কিছু? আর কোন কিছুর জন্যে—!

—নাঃ আর কিছু না। কথার মাঝখানে কথা বলে সে যেন পালিয়ে যেতে চেয়েছিল সেখান থেকে। জেলখানার ভেতরে—

কন্‌ডেম্‌ড সেলের মধ্যে চলে যেতে চেয়েছিল।

এখন আর সে 'এ' ক্লাসের ওয়ার্ডে' থাকে না। এখন থাকে কন্‌ডেম্‌ড সেলের মধ্যে। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার একবার বলেছিল—নাঃ। আর কিছু না।

www.boiRboi.blogspot.com

যে অফিসারটি ইণ্টারভ্যুর সময় হাজির থাকবার জন্যে ঘরে বসেছিলেন তিনি তাকে বলেছিলেন এখনও সময় আছে—।

সে বলেছিল নাঃ—।

সেণ্ট-শ্যাম্পু স্নানের জল, নতুন কয়েদীর কাপড়-জামা দিয়ে গেছে। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। বিহঙ্গিনীকে জাগিয়ে দিয়েছে। অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। সে জেগেই আছে সন্ধ্যেবেলা থেকে। জানতে সে তখনই পেরেছে। সেই সন্ধ্যাতেই।

'এই ভোরবেলায়—।'

তখন থেকেই বিহঙ্গিনী ভাবছে। সেই এক কথা, যা তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে! যার শেখানো উত্তর দিতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে সে বলেছে—হ্যাঁ আমি ওকে। হ্যাঁ। কেমন একটা আক্রোশ হতো। আমি সেই আক্রোশের শোধ নিয়েছি। কিন্তু কিসের আক্রোশ সে জানে না? কি করেছিল সে?

না, সে তার উপর তো ব্যাভিচারী পুরুষের মত—আচরণ দূরের কথা—তার দৃষ্টিতে—। না। তা তো সে দেখতেও কোনদিন পায়নি। না—পায়নি। তবে—? কেন?

যখনই মনে হয়েছে তখনই একটা গভীর নিঃশ্বাস ঝরে পড়েছে—এইখানে—এই নিরুত্তর শূন্যতার সামনে এসে।

আজ সন্ধ্যেবেলা শুধু দীর্ঘনিশ্বাসই ফেলেনি—একান্ত ক্লান্তি এবং অপরিসীম উদ্‌বেগে মনে মনে সে ভগবানকে ডেকেছিল। ভগবানকে সে ডাকে না। না, এমন ক্ষেত্রে ডাকে না। ভগবানকে সে ডাকে বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে অথবা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার প্রার্থনা শুনবার জন্যে। এই রায় যেদিন বের হবার কথা ছিল—তার

আগে সে নিত্য ডেকেছে। চিৎপুরের যত ঠাকুর দেবতা আছে তাদের ডেকেছে। বাগবাজারের মদনমোহনকে ডেকেছে—অন্নপূর্ণা ঘাটের ওখানে যে কালি আছেন তাঁকে ডেকেছে—শনি-সত্যনারায়ণকে ডেকেছে। মানত করেছে। এবং মধ্যে মধ্যে ডেকেছে—ভগবান রক্ষা কর। মানত কিছু করতে পারেনি। কারণ ভগবান বলে কোন ঠাকুর তো নেই।—আঃ ছি—। কথাটা মনে হবামাত্র মনে হয়েছিল—কথাটি তাকে বলেছিল এই লোকটি। এই তার গুরুটি। যাকে সে—। এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি তার মুখ থেকে 'আঃ ছি—ছি—' শব্দটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল।

কি কুক্ষণেই এই লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সচরাচর সে যেতো না এই সব গুরু জাতের লোকের কাছে। গুরু, সন্ন্যাসী, ধার্মিক লোক আর মাস্টার—এক জাতের মাস্টার—এদের নামে সে জ্বলে যেত। দেবতা-স্থানের পাণ্ডা আসত, বাড়িতে পুরুত আসত, তারা কেউ আশীর্বাদী দিয়ে দু-দশ টাকা নিয়ে যেত, পুরুত পুজো-সেরে দক্ষিণে নিয়ে চলে যেত। তারা আলাদা। কিন্তু ওই যে—প্রভু, বসবেন চরণ বাড়িয়ে আর কথামৃত আওড়াবেন—এদের সে সহ্য করতে পারত না। চরণ দুখানিতে পরমভক্তিভরে হাত বুলোনোও তাকে দিয়ে হ'ত না—আর ওই কথাগুলোও শুনতে সে পারত না। গুরুর মুখের চিবানো পানের ছিবড়েও সে হাত পেতে নিয়ে মুখে পুরে মাথায় হাত বুলোতে পারত না। অথচ প্রথম দিনই এই দৃশ্য দেখেছিল।

দৃশ্য দেখেই সে শিউরে বলে উঠেছিল—ওরে সর্বনাশ।

এঁটো চিবানো পান! দাঁতে পায়ওরিয়া আছে না অন্য কোন রোগ আছে—কে জানে? তার সঙ্গিনী আশা কিন্তু দিব্যি হাত পেতে ছিবড়ে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে বলেছিল—নাও। অর্ধেকটা নিয়ো। সবটা না।

সে—ঘেন্নায় যাকে বলে চমকে ওঠা তাই উঠে—নিজের দেহখানাকে পিছনের দিকে হেলিয়ে বলেছিল—না।

—নেবে না?

—ওই—তুই খাবি নাকি ?

আশা উত্তর দেয়নি, সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সবটা মুখে ফেলে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছিল। বিহঙ্গিনী বলে উঠেছিল—ওরে সর্বনাশ !

গুরুর সামনেই বসেছিল তারা দু'জনে। নইলে আশা ওই শ্রীমুখের উচ্ছিষ্ট ছিবড়ে হাত পেতে নেবার সুযোগ পেতো কোথা থেকে—। কিন্তু গুরু কথাগুলো শুনতে পেরেছিল। হেসে বলেছিল—বল—তাই ওদের বল। আমি ওদের বারবার ক'রে বলি! আমি তোমাদেরই মত মানুষ। তার বেশি কিছু না। সত্য হল ঈশ্বর। পরম সত্য। আমার এঁটো পান খেলে কোন কল্যাণ হবে না। কল্যাণ দূরের কথা, অকল্যাণ হবে না একথাও কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সে দায় তোদের, আমার নয় বুঝলি ? কি গো—তুমি কি বল ? এ্যাঁ। হেসেছিলেন ঠাকুর।

একেবারে কোন পরমহংসদেব। আর একেবারে আজকের দিনের এক মডার্ন ইংরাজী নবীশ লীলাময়—এক সঙ্গে জোড়কলমের মত জোড় লেগেছে যেন। লোকটি দেখতে কিন্তু দীপ্তিমান। শুধু ক্লান্তিই নেই—শক্তিও আছে। সবল শরীর, ফরসা রঙ, খয়রা রঙের টানা চোখ। দাঁড়ি-গোঁফ কামানো, কিন্তু চুল আছে। এবং তাকে সযত্ন বিন্যাস। তবু, পানের ছিবড়ে খাওয়ার ব্যাপারটায় সারা অঙ্গটা তাঁর ঘিন-ঘিন করে উঠেছিল।

টুকরো টুকরো ছবিগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। বিকেলবেলা থেকেই যেন একটা কানা-ঘুষো কিছু আশে-পাশে বাতাসে ভেসে-আসা গন্ধের মত—বা—শীত-গ্রীষ্মের স্পর্শের মত তাকে যেন সচেতন করে দিচ্ছিল। বাতাসে ভেসে আসা শব্দের মত নয়। কারণ সবই ছিল নিঃশব্দ। জেনানা ওয়ার্ডের মেটরা অকারণে তার সেলের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে ইঙ্গিত যেন ছিল। তবে মন সচেতন না-থাকলে তো ধরা যায় না।

তারপর সেনট্রি।

মনে পড়ল—সকালবেলা জেলার সাহেব সুপারসাহেব এসেছিল। কথাও বলেছিল।

বলেছিল—তোমার কোন অসুবিধে নেই তো ?

সে বলেছিল—নাঃ—

অসুবিধে তো ছিল না। ফাঁসীর হুকুম হবার পরও তো সে 'এ' ক্লাসের সুবিধেগুলো পাচ্ছিল। অকস্মাৎ এসে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করায় সে ভেবেছিল—সুপার সাহেবটি ওই অছিলা করে তাকে একবার দেখে গেলেন—কথা বলে গেলেন। বিকেলবেলা মনে হল—তাই তো সবাই তাকে দেখে যায় কেন ? আর—

আর অন্যদিনের দেখার চাউনির সঙ্গে আজকের চাউনির তফাত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে কেন ?

ফাঁসীর হুকুমের মুহূর্তটা কি ভীষণ ! কয়েক মুহূর্তের জন্য—যে কি অবস্থা হয়েছিল—তা ভাল করে মনে পড়ে না। তারপর ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর থেকেই মনটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। যেন মনের সাড়া কমে আসছে। মধ্যে মধ্যে ভয় হয়। হঠাৎ চমকে ওঠে ভয়ে। কথাটা মনে পড়লেই এমন চমকানিতে মনের সঙ্গে দেহখানাকে কে যেন কেড়ে নেয়। তারপরই একটা বিহ্বল উদ্‌বেগ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপরই অসাড় হয়ে পড়ে। নিজের মনের গভীরেই কে যেন মৃদুস্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে। মায়ের পুরোনো সন্তান-শোকের কান্নার মত। এ-কান্নায় পৃথিবীর কাছে সহানুভূতির প্রত্যাশা নেই—এবং নিজের মনেই যেন লজ্জা আছে। থাকতে থাকতে মনের গভীরেও কান্না থেমে যায়। এলিয়ে যায় ঘুমিয়ে যাওয়ার মত। মন ঘুমোয় না—কান্নাটা ঘুমোয়। তারপর এলোমেলো হয়ে যায়।

মনের এমনি এলোমেলো অবস্থা ছিল বেশ কিছুক্ষণ। কোন একটা চিন্তাকে আঁকড়ে ধরেও দাঁড়াতে পারছিল না। যে চিন্তাকেই ধরছিল—সেটাই যেন মচকে ভেঙে নুয়ে পড়ছিল বা হাত থেকে ফসকে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সেনাট্রিটার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই কেমন ক'রে স্প্রিংয়ের মত ঘাড়-শুদ্ধ মাথা নেড়ে শব্দহীন প্রশ্ন করেছিল—কি ?

সেনাট্রিটা ঢোক গিলেছিল।

সে আবার শব্দহীন প্রশ্ন করেছিল ঘাড় নেড়ে—হবে বুঝি ? মুখটা তার নড়েও উঠেছিল।

সেনাট্রিটা এবার ঘাড় নেড়ে—'হ্যাঁ' জানিয়ে চোখ নামিয়েছিল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে শব্দহীন উচ্চারণে বলেছিল—কাল।

তখন থেকেই টুকরো-টুকরোভাবে আপনি পুরনো ছবিগুলো মনে ভেসে উঠছে। মধ্যে-মধ্যে মন বলে উঠছে—কি করলে বল তো ? কেন করলাম ?

পুরনো প্রশ্নগুলো আসছে। কেন লোকটাকে দেখলে আক্রোশ জাগত ? খুন করে মনে হয়েছিল শোধ নিয়েছে ?

এরপর সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এবং সে এসে হঠাৎ একসময় দাঁড়িয়েছিল উত্তরহীন ধ্বনিহীন এক অতল-অনস্তিত্বের অথৈ পারাবারের সামনে।

তারপরই সে পিছন ফিরে পালিয়ে এসেছিল শোকার্ত অনুতপ্ত বেঁচে থাকার মধ্যে। এবং প্রশ্ন করেছিল—ওঃ কি কুক্ষণেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কেন ? কেন দেখা হয়েছিল ? ও নিজে আসেনি দেখা করতে—বিহঙ্গিনীই গিয়েছিল। গুরু, সন্ন্যাসী এদের ওপর তার কোন আকর্ষণ ছিল না—বিশ্বাস ছিল না—তবু গিয়েছিল। গিয়েই—

মনে পড়ল পানের ছিবড়ে নিয়ে প্রসঙ্গটার ছবি।

সমস্ত শরীর যেন রি-রি করে উঠেছিল।

তাকে বার বার বারণ করেছিল থিয়েটারের ম্যানেজার। তুমি অন্ততঃ যেয়ো না সুচন্দ্রা ! তিনি তাকে সুচন্দ্রা বলেই ডাকতেন। বিহঙ্গিনী সকলে বলত, তিনি বলতেন না।

বলেছিল—দেখ অন্যে না জানুক আমি তো তোমাকে জানি !

সুচন্দ্রা কি জবাব দেবে ঠিক করতে পারেনি। ম্যানেজার যে কম্‌প্লিমেণ্ট তাকে দিলেন—তার মান রেখে তার যাওয়ার ইচ্ছেটা বর্জন করাই উচিত ছিল। কিন্তু—। কিন্তু আশ্চর্য একটা কৌতূহল তাকে আকর্ষণ করেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

থিয়েটারে মেয়েরা একবাক্যে বলছে—পরমহংসদেবের পর এমন পবিত্র মানুষ আর হয়নি। একেবারে শিশুর মত নিষ্পাপ।

ম্যানেজার বলেছিল—সুরেনের বাড়ীতে সেই প্রথম পরিচয়ের দিন যা বলেছিলে তা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

মনে ছিল সুচন্দ্রার। সেদিন সে-কথা মনে করে সে হেসেছিল। এবং বলেছিল—খুব আশ্চর্য হয়েছিলে, না? গৌরবে হেসে ফেলেছিল সুচন্দ্রা।

—হব না? ম্যানেজার বলেছিল—সাংঘাতিক কথা যে! একেবারে প্রথম আলাপের দিনেই বললে—'আমি কিন্তু সুরেনবাবুর বিয়ে-করা বউ নই। আপনার বন্ধুর বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সেও আমি জানি। কিন্তু লোকটা আর্টিস্ট, আর দুটো তিনটে বউ নিয়ে ঘর করবার মত রোজগার করে। সেই কারণে—এসেছি ওর সঙ্গে বাস করতে। ওর আমাকে প্রার্থনা ছিল। আমার দিক থেকে বলতে পারি এ্যাডমিরেশন ছিল এবং আছে।

মনে পড়ছে—তার কথা শুনে ম্যানেজারের সেই হতভম্ভ-হয়ে-যাওয়া মুখ। দেখে সুচন্দ্রার হাসি পেয়েছিল। সেই প্রথম আলাপের দিনেও পেয়েছিল এবং কথাটা সেদিন যখন নিজেই বললে—তখনও পেয়েছিল। এবং হেসেও ছিল।

ম্যানেজার বলেছিল—তুমি সন্ন্যাসী গুরু কিংবা বাবা কিংবা ঠাকুর দেখতে যাবে—এ আমি কল্পনাই করতে পারিনে।

—যাই না। দেখেই আসি।

—কেন? মন আর সে-মন নেই। দুর্বল হয়েছে?

—নাঃ। দেখতে যাব। এই ধেড়ে নিষ্পাপ শিশু ঠাকুরটিকে দেখতে যাব।

—ঠাট্টা করতে যাবে ? না, তা যেয়ো না।

তবু সে নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি। গিয়েছিল। লোকটির তরুণ দীপ্ত সবল চেহারা এবং এমন কটকটে কথা—তার সঙ্গে হাসি—এ তার কাছে কেমন যেন আশ্চর্য মনে হয়েছিল। এর আগে তাকে এমন করে তো কেউ বলেনি। ওর বেশি জোর আছে, তাই জোর করে লোককে কাঁদাতে চায়।' 'হুঁ'! 'বেশি জোরে চীৎকার করে কাঁদলে সে কান্না কি ভালো লাগে মানুষের ?'

কথাগুলো তাকে বিদ্ধ করেছিল। বাঁকা বঁড়শীর মত তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

লোকটি একজন ঠাকুর। দেশটাই তো ঠাকুরের। চ্যালা চামুণ্ডা নিয়ে সেজেগুজে বসতে পারলেই হল। চাই সুন্দর চেহারা, ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা কথা—হা-হা ক'রে হাসি ; তার উপর যদি গানের গলা থাকে তবে তো স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক পায়ে গড়িয়ে পড়ল। ঠাকুর থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন—সেই সময় বলেছিলেন কথাগুলি। স্টেজ থেকে প্রথম তাকে দেখেছিল সুচন্দ্রা। থিয়েটারের অনেকে তার শিষ্য-শিষ্যা ছিল। তার মধ্যে নাচিয়ে আশা একজন। তারাই ঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গের লোকদের বক্সে বসালে, মালা দিলে প্রণাম করলে। সুচন্দ্রা অভিনয় করত এ বইখানায় খুব ইমোশন দিয়ে! লোকে কাঁদত। কিন্তু এই ঠাকুরটি অভিনয় দেখে গেল চুপচাপ বসে। হাসলে না, কাঁদলে না। কাঁদা দূরের কথা, একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললে না। সুচন্দ্রা শেষ পর্যন্ত প্রাণ ঢেলে অভিনয় করে সত্যি সত্যি নিজে কাঁদল, তবু লোকটি কাঁদল না। শুধু একবার হাততালি দিলে এইখানটায়।

অভিনয়-শেষে ঠাকুরকে ওরা স্টেজের ভিতর এনে বসিয়েছিল। সকলে প্রণাম করছিল। সে-ও আসছিল তাকে প্রণাম করতেও বটে—তা ছাড়া কাছ থেকে দেখতে। কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুরকে ঘিরে ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ঠাকুর কথা বলছিলেন। অভিনয়ের কথা বেশ হয়েছে গো

ভালো করেছ। ভালো লাগল। অনেক দুঃখের কথা লিখেছ। হ্যাঁ, সংসারে তো অনেক দুঃখ! কিন্তু দুঃখ যেন বড্ড বেশী লাগল। তোমাদের হিরোইন দুঃখকে খুব জোরালো করে তুলেছে। যেন অভিনয় বড় বেশি করেছে। ওভার-এ্যাক্‌টিং। সে শুনে থেমে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুর বলেই চলেছিলেন—অভিনয় খুব শক্ত কাজ। সব থেকে বড় অভিনেতা কে জান? ঈশ্বর! ভগবান। দেখ না, একসঙ্গে কত পার্টে অভিনয় করছে। ভেবে দেখ। বাঘও সেই, হরিণও সেই। বাঘ হুঙ্কার দেয়, হরিণ আর্তনাদ করে। তার মধ্যে জোরের কথাটা তো বড় নয়, বড় হল—অকৃত্রিমতার কথা অভিনয় অভিনয় বলে মনে হবে না। তবে তো। ও মেয়েটির জোর বড় বেশি গো। জোর করে কাঁদতে চায়। কিন্তু জোর চীৎকার করে কাঁদলে কি ভাল লাগে? জোর করে রাগকে জোরালো করলে ভয়ঙ্কর লাগে না? বল না তোমরা, তোমরাই বল? 'ওরে বাপরে টুটুল'—বলে এত জোরে কাঁদলে, ঠিক কাঁদছে বলে মনে হল না তো। মনে হল টুটুলকে শাসাচ্ছে।

সে ফিরে চলে গিয়েছিল নিজের সাজবার ঘরে, সেখান থেকে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে এসে গাড়ী ডাকিয়ে বাড়ী চলে গেল।

পরের দিন রবিবারে ম্যাটিনী শোয়ের মেক-আপ্‌ নিয়ে আশাকে বলেছিল—আশা, তোদের ঠাকুর তো বড় ভাল অভিনয় করেন রে। উনি বুঝি সাক্ষাৎ ঈশ্বর?

আশা একেবারে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু থামিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার। বলেছিল—প্রণাম কর, রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম কর। ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন। উনি তার প্রমাণ। আড়ালে তাকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি কি? প্লে নষ্ট হবে!

থিয়েটারের অভিনেত্রীই ছিল না সে। থিয়েটারের সর্বেসর্বা ছিল এক রকম। সুতরাং থামতে হয়েছিল।

সোম মঙ্গল বুধ বাদ দিয়ে বৃহস্পতি, সেদিনও সে তৈরী হয়েই

গিয়েছিল—কারণ রবিবারের পর সেদিন ঠাকুরের ভক্তদের একটা দলবদ্ধ আক্রমণ হবার কথা। ওদিকে ম্যানেজার নোটিস দিয়েছে যে কেউ এই আলোচনা করতে পারবে না। বিহঙ্গিনীকেও বলেছে—না-না—এ ভালো না, এসব করতে নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

বৃহস্পতিবারে কিন্তু ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গেল। বর্ষার সময় পশ্চিমে হাওয়ার বর্ষণ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পূবে হাওয়ার ঠেলায় বাদল বর্ষা হয়ে গেল। শুক্রবারে দৈনিক কাগজগুলির রঙ্গমঞ্চের জন্য এক পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট আছে। একখানি বড় কাগজের রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াছবির পৃষ্ঠায় পুরো দেড় কলম সমালোচনা বের হল তাদের নাটকের। লিখেছেন—আনন্দ সুন্দর। তার মানে এই ঠাকুর!

সে সমালোচনা যেমন বিস্তৃত তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর নিখুঁত! নাটক অভিনয় আলোক-সম্পাত দৃশ্যটা সমস্ত কিছুর নিরপেক্ষ সত্য আলোচনা। এদেশের প্রাচীন আধুনিক নাট্যসাহিত্য শাস্ত্র বিদেশের অর্থাৎ ইয়োরোপের নাট্যসাহিত্য শাস্ত্র থেকে নজীর তুলে আলোচনা করেছেন।

পরে ম্যানেজার বলেছিল—ওরে দাদা! লোকটা তো সামান্যি না।—এ যে ভীষণ পণ্ডিত ব্যক্তি। বিহঙ্গিনীকে কাগজখানা ফেলে দিয়ে বলেছিল—পড়ে দেখ। তোমার সম্পর্কে মজার কথা বলেছে।

—মজার কথা?

হ্যাঁ, মজার কথা। বলেছে এ মেয়ে জাত অভিনেত্রী, প্রতিভাশালিনী, এই বাজে নাটকখানাকে স্টেজে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এই মেয়েটিই। বাজে নাটক, তাই তাকে অভিনয় করতে হয়েছে বাজে অভিনয়। অবাস্তব ইমোশন-সর্বস্ব পার্টে চেঁচামেচি করে ইমোশন ঢেলে অর্থহীনভাবে হেসে কেঁদে দর্শকদের মনকে সারাক্ষণ ব্যস্ত করে রেখেছে—চিন্তা করবার অবকাশ দেয়নি। কোনদিন যদি এই মেয়েটি স্টেজে না-নামে—সেদিন দর্শকেরা সম্ভবতঃ অভিনয় শেষ পর্যন্ত দেখতেই পারবে না। বাল্যকালে দেখেছি যাত্রাভিনয়ের আসরে ভীমের ভূমিকায় অভিনয়ে প্রয়োজন হত বীররসের নয়, বীররসকে

ভ্যাঙচানোর। কিন্তু তাতেই হত আসর মাৎ। এই ক্ষেত্রে এই অভিনেত্রীটিও ঠিক তাই করে সকৌতুকে নাটকটিকে জমিয়ে রেখেছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। নাটকখানা অভিনয়ের সময়েই এ কথা হয়েছিল।

ম্যানেজার ডিরেক্টর একই লোক, তিনিও গুণী লোক, লেখাপড়া জানা এবং বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর! পরপর খান তিনেক নাটকে মার খেয়ে—নাটকখানাকে ধরেছিলেন। ধরে ছিলেন—ওই জন্যেই। আবেগসর্বস্ব নাটক। গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা, চীৎকার এবং কায়দা মাফিক প্রবেশ ও সবেগে প্রস্থান করতে পারলেই মোটামুটি চলে। এর মধ্যে সুকৌশল আলোক-সম্পাতের ম্যাজিক ঢুকিয়ে দেবারও অবকাশ করে নেওয়া যেতে পারবে।

নাটকখানা তার হাতে দিয়েই ম্যানেজার বলেছিল—দেখ। তুমি যদি রাজী থাক—একটু Cheap acting করতে পার—তা হলে মনে হয় নির্ঘাত হিট। সে প্রথম পড়ে বলেছিল—না। ছি! এই বই আবার করে! কর-কর, আমি নেই। মা গো—ছেলে মরেছে, না হয় না খেতে পেয়ে মরেছে, কিন্তু তাই বলে মা তার পথে ভিড়ের মধ্যে মাইয়ে হাত দিয়ে চীৎকার করবে—'ওরে আমার বুকের ক্ষীর যে ঝরে যায় রে! বুকখানা যে ফেটে যায় রে। বুকখানা যে ফেটে যায় রে! টুটুল রে—টুটুল!' দূর, ও আমি পারব না।

ম্যানেজার বলেছিল—দেখ, তোমাকে বলবার কিছু নেই। তুমি লেখাপড়া জানো। বই ভালো তোমার লাগবে না সে-কথা তো বলেই বইখানা ধরেছিলাম সামনে। কিন্তু থিয়েটারটা যে ডুবতে বসেছে। আর্ট—ফাইননেস্ অফ ড্রামা—লিটারারি ফ্লেভর কোয়ালিটি এসব তো অনেক চটকানো হয়। এমন ম্যাজিক পলিটিক্যাল বক্তৃতা—বিট্‌লেদের গানের সুর—বোল্ড সেক্স অ্যাপীল এই পাঁচ রকমে যদি, মানে, এবং, অর্থাৎ—এই আর কি! ভেবে দেখ—তোমার জন্যে আমি নেহাৎ কম করিনি। হিট হলে—শোধ ফারখৎ—বুঝলে।

পিছনের বড় মর্মান্তিক স্মৃতির বোতলটা জল থেকে জালে টেনে

তুলে বোতলের ছিপিটা খুলে দিয়েছিল ভবেশবাবু। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত অতীত কথা বেরিয়ে আসছিল—।

মনে পড়ছে সুচন্দ্রার—সে সেদিন একেবারে অকারণে বারকয়েক অনেকটা পাগলের মত বলে উঠেছিল—আঃ! আঃ! দূর! না!

আজও সে-কথা মনে হয়ে এই ফাঁসীর আসামী ঘরে বসে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ঢং—ঢং।

জেল-গেটে ঘড়ি বাজছে!

ঢং—ঢং—।

এক দুই তিন চার—

ঢং ঢং।

কাল ভোরবেলা। সূর্যোদয়ের আগে। সেই রকমই শুনেছে সে পাঁচটা বোধহয়। তাহলে? আর এগারো ঘণ্টা আছে!

* * *

সেই অতল এক নিরুদ্দেশের অথৈ বিস্তারটা একেবারে সামনে—হয়তো বা এগারো পা জমির ওপাশে যেটা রয়েছে—সেটাতে একটা টলমলানি জাগল। পিছনের দিকে তাকিয়ে সামনের ওটার কথা ঠিক যেন মনে ছিল না।

আকাশে আলো ম্লান হয়ে এসেছে। জেলখানার ওয়ার্ডগুলোর দেওয়ালের ভিত থেকে অন্ধকার যেন শীতের ভোরের জলা-জমির বুক থেকে ওঠা কুয়াশার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেঁপে বিস্তৃত হয়ে ওপরের দিকে উঠছে।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তালা-বন্ধ হচ্ছে।

কাঁকর ফেলা পথের উপর ভারী বুটের শব্দ উঠছে। ওয়ার্ডার আসছে, তার সেলের বাইরের দরজাটা খুলে ভেতরের দরজাটার তালা টেনে দেখে—বাইরের তালাটায় চাবি দেবে। বার দুয়েক ঝাঁকি দিয়ে দেখবে।

ওটা নিয়ম।

তারপর চাবির থলেটা নিয়ে চলে যাবে। একবার তাকিয়ে দেখে যাবে তাকে।

এতে সে প্রতিদিনই কৌতুক অনুভব করত। আগে আগে বেশি। ক্রমে সেটা কমে আসছে। আজ যেন অনুভবই করলে না।

মনের সামনে তার সেই অতল নিরুদ্দেশের অথৈ সমুদ্রটা টলমল করছে—সন্ধ্যের আবছা ঝাপসা আলো বা বেলায় মধ্যে যে-টুকু দীপ্তি আছে ভাই প্রতিফলিত হচ্ছে—এবং তাকে আকর্ষণ করছে। সত্যি টানছে তাকে। মনের ভিতরের নব অনুভবের স্পন্দন যে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বুকটা কেমন যেন ভেঙে আসছে।

ওঃ, ফাঁসী—মৃত্যুদণ্ড কি ভয়ানক! ওঃ! কাঁদতে পারে না কেন?—

আশ্চর্য!

ওঃ!

বাইরের পৃথিবীর কোলাহল আসছে। কিন্তু বিহঙ্গিনী তা যেন শুনতেই পাচ্ছে না। খুব কি গরম মনে হচ্ছে।

জেলখানার ভিতরেও কলরব উঠছে। কয়েদীরা যে যার ওয়ার্ডে এসে জমেছে। কথা হচ্ছে। ঝগড়া হচ্ছে! ওরা এক এক ঘরে ক'জন করে থাকে?

সব হারিয়ে যাচ্ছে। অথবা বিহঙ্গিনীই হারিয়ে যাচ্ছে।

আবার পিছন দিকে চোখ কখন ফিরে যায়।

জীবনের অতীত-টা, সেই জল থেকে তোলা বোতলের ছিপি-খোলা মুখ থেকে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

নাঃ। তুমি ঢুকে যাও। নাঃ—। কিন্তু তা তো ঢোকে না।

তা থেকে প্রকাশ পায়, স্মৃতির টুকরো। চোখ বুজলেও রেহাই নেই, মনের চোখে ভাসে। ঘুমুলে স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়।

ম্যানেজার বলেছিল হিট হলে শোধ ফারখৎ! উপকারের ঋণ।

হ্যাঁ, উপকার সে করেছিল। নিশ্চয় করেছিল। সে কেউ ভুলতে পারে না।

সুরেন আর্টিস্ট। তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল স্বামীকে ছেড়ে। ভবেশ—থিয়েটারের ম্যানেজার—সিন এবং সেট ইত্যাদির জন্যে সুরেনের সঙ্গে তার কারবার ছিল, তার সঙ্গে এক ধরনের বন্ধুত্বও ছিল। মদ খাওয়ার বন্ধুত্ব, অভিনেত্রী নিয়ে হুল্লোড় হৈ হৈ করার পার্টনার-শিপের বন্ধুত্ব। এর মধ্যে এতটুকু খাঁটি বস্তু ছিল না এমন অবশ্য কেউ বলতে পারে না। সুরেনের সে বিয়ে করা বউ নয় একথা ভবেশ জানত। সুচন্দ্রা নিজেই বলেছিল প্রথম দিন আলাপের মধ্যে। আমি কিন্তু সুরেনের বিয়ে-করা বউ নই!' কথাটা শুনে ভবেশ আশ্চর্য হয়নি এবং যখন একদা সুরেনের সঙ্গে বনিবনাত না-হতে শুরু করল তখনও সে আশ্চর্য হল না—সে অবনিবনাত অর্থাৎ মনান্তর-মতান্তরের মধ্যে। বিহঙ্গিনী নয়—; না, তখন বিহঙ্গিনী নয় —তখন সুচন্দ্রা ; সুচন্দ্রা একদিন সুরেনের গালে চড় মেরেছিল, সুরেন পাল্টে তাকে পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে এক চড়ের বদলে সাত-আট ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে কুৎসিত গালাগাল দিয়েছিল।

কুৎসিত অশ্লীল!

সকল কুৎসিত বা অশ্লীলপনায় যে-জন ভাগের ভাগী সমান অংশীদার, যে-যখন কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজ করে—তখনই সব থেকে বেশি লাগে। সুরেন তাকে গাল দিয়েছিল, স্যাণ্ডেলের প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে চীৎকার করে বলেছিল—খান্‌কী, কসবী, কুত্তি। এমনই কটু এবং অশ্লীল লেগেছিল যে, সে বিহ্বল হয়ে গিয়ে বলেছিল —কি-কি-কি?

সুরেন আবার উচ্চারণ করেছিল শব্দগুলো। এরই মধ্যে ভবেশ এসে ঘরে ঢুকেছিল। সুরেন তাতে দমেনি। গান দিয়েই চলেছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলে ভবেশ। সে বলেছিল—এই সুরেন—সোয়াইন কোথাকার। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ছোঁয়ায় বারুদ জ্বলে উঠার মত সে ছুটে গিয়ে ভবেশের হাত ধ'রে বলেছিল—আমাকে এখান

থেকে নিয়ে চলুন ভবেশবাবু। আমাকে বাঁচান। সুরেন এসে তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলেছিল—ও ঘরে চল!

—না।

—চলো—

—না—

—চ—লো—বলছি—। সুরেন আর্টিস্ট এবার কঠিন মুঠোয় তার হাত এমন করে চেপে ধরেছিল যে তার হাতের কাচের চুড়ি ভেঙে হাতের মাংসের মধ্যে কেটে বসে গিছল। সে কেঁদে উঠেছিল —উঃ—মা!

ভবেশ ম্যানেজার চটেই ছিল সুরেনের ওপর। সে রূঢ়কণ্ঠে বলেছিল—সুরেন।

সুরেন বলেছিল—শাট্ আপ! That bitch is mine. আমার ইচ্ছে হলে ওকে আমি হুইপ করব।

ভবেশও খেপে গিয়েছিল, বলেছিল—তুমি শুধু ইতর নও—বীস্ট —beast—জানোয়ার তুমি। সুচন্দ্রাকে তুমি বিচ্ বলছ—? তোমার মুখখানা ভেঙে দেওয়া উচিত।

মানুষ কেনা যায় না ভবেশ—ওকে আমি কিনেছি। I purchased her—সেই কারণে বলছি ও বিচ্। What do you say —এ্যাঁ? এরপর কি বলতে চাও? ফোর থাউজেণ্ড রুপীজ ক্যাশ।

সুচন্দ্রা তার গায়ের গয়নাগুলো খুলে তার সামনে ফেলে দিয়ে বলেছিল—এই নাও, এই নাও—এই নাও—

ভেঙিয়ে সুরেন বলেছিল, ওগুলো আমারই দেওয়া সুচন্দ্রা!

কিনে এনে দিয়েছি। টাকা আজও শোধ করিনি।

আর পারেনি সুচন্দ্রা, প্রচণ্ড বর্ষণে অকস্মাৎ একসময় হেলতে হেলতে উৎপাটিতমূল গাছের মত পড়ে গিছল। সত্যিই সে উপুর হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সুরেন ভবেশকে বলেছিল—তুমি যাও ভবেশ। তুমি আর এসো না দয়া ক'রে।

ভবেশের ঘাড়ে কি ভর করেছিল, তা বলতে পারে না। সে বলেছিল—যাব। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই—What do you mean—I have purchased her মানে কি? উনি গয়না খুলে দিতে চাইলেন। কেন? তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি না, ওঁকে করছি। বলুন সুচন্দ্রা দেবী।

www.boiRboi.blogspot.com

সুচন্দ্রা সশব্দে কেঁদে ওঠে সেই কান্নার মধ্যেই বলেছিল—আপনি ওকে চার হাজার টাকা দিয়ে আমাকে বাঁচান। আমাকে আপনি কিনুন। ভবেশবাবু—। পারেন দিতে ওকে চার হাজার টাকা? আমি সত্য অর্থে বাঁদী হব।

ভবেশ তখন একখানা প্রচণ্ড হিট্ বইয়ের সাক্সেসের পর খুব সমারোহ করে নতুন বই খুলছে। তার প্রোডাকশনের মোটা দিকটা সুরেনকে দেবার কথা। ভবেশের হাতে টাকারও অভাব নেই। ভবেশ সুচন্দ্রার কথার জবাব না- দিয়ে কথা বলেছিল সুরেনকে—আমি যাচ্ছি সুরেন, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাই। আমি আজই ব্যাপারটা ডি-সি নর্থকে জানাব এবং ডি-ডিতেও জানাব। আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খতম। আমার কাজ আমি অন্যকে দিয়ে করাব। তুমি যেন বিনা পারমিট কি বিনা টিকিটে থিয়েটারের কপাউণ্ডে ঢুকতে চেষ্টা করো না। করলে অনুতাপ করতে হবে।

—ভবেশ! সুরেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

—না। আমি চললাম।

—ভবেশ—তুমি কি চাও বল? আমার কাছে নীতি আদর্শ চালিয়ো না। সোজা বল কি চাও? ওই মেয়েটাকে চাও?

—চাই।

—বেশ—আমাকে চার হাজার টাকা দিয়ে দাও and you take her—আমি ওকে রিলিজ করে দিচ্ছি। যদি চাও, কাগজে বিক্রি করলাম বলে লিখে দিচ্ছি।

ভবেশ বলেছিল—না। আমি ইতর নই তোমার মত—। আমি

কিন্তু চেক দিচ্ছি। নগদ টাকা এক্ষুনি নেই!

একটু ভেবে সুরেন বলেছিল—আচ্ছা তাই দাও। টাকার ব্যাপারে তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমার চলবে না। চেকই দাও। কিন্তু থিয়েটারের প্রোডাকশনের সবটা আমাকে দিতে হবে।

পকেট থেকে চেক-বই বের করে চেক লিখে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল—ধর। সুচন্দ্রা দেবী—আপনি উঠুন। চলুন আপনি কোথায় যাবেন।

সুচন্দ্রা বলেছিল—ওর কাছে একখানা কাগজ আছে ফেরত নিন।

কাগজ? কিসের কাগজ?

সুরেন কোন কথা বলেনি নিজের পোর্টফোলিও খুলে তার ভেতর থেকে খুঁজে বের করেছিল একখানা কাগজ। একটু হেসেই বলেছিল—এই নাও। কে নেবে—কাকে দেব, বল?

সুরেনের দাঁতগলো খুব বিশ্রী ছিল। কালো কালো দাগে ভর্তি—বড় বড়, অসমান এবং ফাঁকে ভর্তি দাঁত। দুটো দাঁত নেই—তাতে ছিল সোনার দাঁত। একটা ভালগার লোক। কিন্তু ছবি আঁকতো ভাল। আ লাল্‌সা ছিল তার অশেষ।

ভবেশ হাত বাড়িয়েও হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। সুরেনের হাত থেকে কাগজখানা খসে পড়ে গিয়েছিল মাটির ওপর।

ভবেশ কাগজখানা তুলে নিয়ে কাগজটায় লেখকের সই দেখে বিস্মিত হয়েছিল। 'পার্থ মুখার্জী।' সবিস্ময়ে নামটা উচ্চারণ করে বলেছিল—'পার্থ মুখার্জী?'

সুরেন বলেছিল—পড়ে দেখ। সুচন্দ্রাকে হস্তান্তর করেছিল আমার কাছে ওই টাকা নিয়ে। সুচন্দ্রার বিয়ে করা স্বামী হল পার্থ মুখার্জী।

—পার্থ মুখার্জী! বিলাতী গানের ন্যাকা আর্টিস্ট?

—হ্যাঁ।

—মাই—গড্! বিস্ময়ভাব সবটা প্রকাশ করতে গিয়েও পারেনি। হতবাক হয়ে গিয়েছিল ভবেশ।

ভবেশ কাগজখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল সুচন্দ্রার দিকে।

সুচন্দ্রা কাগজখানা নিতে নিতেই বলেছিল—এ কাগজের কথা বলিনি। আমি বলছি হ্যাণ্ডনোটের কথা। তোমার নিজের কথাগুলো আমার মনে আছে সুরেন। তুমি সেই নরকের শূকরটাকে বলেছিলে—এ চিঠি আমি রাখছি কিন্তু এর দাম কি বলো? এ যুগে বিক্রি করলাম লিখে দিলেও কাউকে বিক্রি করা যায় না, এমন কি 'আমি স্বেচ্ছায় এত টাকা নিয়ে বিক্রি হলাম' বলেও যদি বিভা লিখে দেয় তাতেও বিভা বিক্রি হবে না। আমি তোমাকে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছিলাম। সেই হ্যাণ্ডনোট ফিরে চাই আমি।

That's all right সুরেন। দ্যাট্‌স অল রাইট। তোমার প্র্যাক্‌টিক্যাল সেন্সকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করি। তাই হবে। আমিও লিখে দিতে পারি। তবে তুমিই বলছ—তার আর দাম কি? বিভা বলেছিল—তুমি থাম পার্থ। তোমাকে সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সুরেনকে হ্যাণ্ডনোট আমি লিখে দিতে চেয়েছি। আমিই দেব। বিক্রি যদি হতে হয় তখন আমি নিজেই বিক্রি হব। তুমি আমাকে বিক্রি করবে—সে হ'তে আমি দেব না।

নির্লজ্জের মত পার্থ বলেছিল—সুরেন তোমার কাছে রেভিন্যু স্ট্যাম্প আছে তো!

সুরেন সঙ্গে সঙ্গে তার পার্স থেকে রেভেন্যু স্ট্যাম্প বের করেছিল।

পার্থ বলেছিল—তুমি খুব প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক সুরেন। I admire you:

বিভা বলেছিল বল সুরেন, আজ পর্যন্ত কত টাকা তুমি দিয়েছ?

সুরেন বলেছিল—থাক বিভা। দরকার নেই।

—আছে। বল।

সুরেন হিসেব দিয়েছিল—সাড়ে তিন হাজার টাকার।

পার্থ বলেছিল—ওটা তা'হলে চার হাজার লেখ বিভা! সুরেন আজকে আমাকে পাঁচশো টাকা দেবে। আমার শেষ পাওনা।

ডাইভোর্সে সম্মতি দিয়ে যে পত্রটা দিচ্ছি তার একটা দাম তো তোমায় পাওয়া চাই। না কি বলো বিভা ?

বিভার বদলে সুরেন বলেছিল—না। তোমাকে এক পয়সাও আর দেব না।

পার্থ হেসে, ঘাড় নেড়ে বলেছিল—তা হলে হ'ল না।

কথাগুলো ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলেছিল—তা হ'লে হ'ল না। তুমি যা খুশি করতে পার। বিভাও পারে। তুমি জানো—তোমরা মেয়েদের যে বস্তুটিকে বলো এবং যেটিকে অত্যন্ত ডিভাইন মনে কর—তাকে যদিও আমি মিথ্যে বলে মনে করি, তার একটা খুব বড় দাম আছে। বিভার মায়ের সঙ্গে তার বাপের বিয়ে হয়নি। ওকে বিয়ে করে, আমিই ওকে সেই ডিভাইন বস্তুটি অর্জনের সুযোগ দিই। এখন ডাইভোর্সে সম্মতি না দিলে—সেটি গেল। ভেবে দেখ।

* * *

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হল ব'লে একটা কথা আছে। সত্যিই তাই হয়েছে। প্রকাণ্ড ফণা তুলে সাপটা সামনে দাঁড়িয়েছে। জিভ দুটো লক লক করছে। না—অধীর অস্থির হয়ে উঠল বিভা বা সুচন্দ্রা বা বিহঙ্গিনী। সুচন্দ্রা বলাই উচিত, কারণ ওই নামে বিচার হয়েছে। না—বিহঙ্গিনী ওর সবচাইতে প্রিয় নাম—রূপসী বিহঙ্গিনী।

অস্থির সুচন্দ্রা—না বিহঙ্গিনী ভুলে গেল যে আগামী কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তার ফাঁসী হবে। সাপের মত স্মৃতি ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। অস্থির সুচন্দ্রা অকারণে ন'ড়ে চ'ড়ে বসল। মাথায় ওর একরাশি চুল। ওর দুর্লভ রূপের মহার্ঘ সম্পদ। সেই চুলের এলোখোঁপাকে সে অকারণে খুলে দিলে। এলিয়ে দিলে। তারপর দুই হাতের মুঠোয় ধ'রে—টেনে সামনে এনে তার মুখের উপর ফেলে দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেললে। অভিনয়ের সময় এই ভঙ্গিতে অনেকবার চুল টেনেছে। আজ অভিনয় নয়, অকৃত্রিম আবেগে যেন আপনা-আপনি ওই কালো চুলের রাশি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে—চোখের সামনে পৃথিবীকে ঢেকেছে।

ম্যাড-সিনগুলো এতে খুব জমত। আজ কিন্তু সে সত্য সত্যই পাগল হয়ে যেতে চাচ্ছে। চুলের রাশি মুখের সামনে ফেলে দু'হাতে সজোরে টেনে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পার্থ। পার্থ মুখার্জীকে মনে পড়ছে। এমন ভাবে মনে পড়ছে যে সে যাও বললেও যাচ্ছে না।

রাত্রিটা শেষ হবার আগেই অর্থাৎ সূর্য উঠবার আগেই তার ফাঁসী হবে, এর চেয়েও মর্মান্তিক এক স্মৃতির জ্বালায় বিহঙ্গিনী—না—সুচন্দ্রা তার অভ্যস্ত অভিনয়ের ভঙ্গি ছাড়া অন্য কোন ভঙ্গিতে নিজের এই জ্বালায় পুড়ে যাওয়া অন্তর বা মনকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারলে না।

ঢং ঢং—; আবার ঘণ্টা বাজছে। ক'টা বাজল? ছ'টার পর সাতটা? চং ঢং ঢং। সময় কার জন্যে থামবে? সে ঠিক চলছে। ঢং—ঢং—ঢং। সাতটা নয় আটটা। সাতটা কখন বেজেছে খেয়াল করেনি।

অন্য অন্য ওয়ার্ডে এখনও কয়েদীদের সামাজিক আসর চলছে। জেল পাঁচিলের বাইরের পৃথিবী থেকেও মানুষের আসরের সাড়া আসছে। ঢোল করতাল বাজিয়ে কারা গান-বাজনা করছে। ট্রামের বাসের সাড়া উঠছে। জেলের মধ্যে রেডিয়ো চলছে। ছড়া পাঁচালীর গান—বোধহয় খুব জমেছে।

না—তো! না। আজ রেডিয়ো চলছে। ছড়া পাঁচালী গান বাজনা নেই। কাল একটি মেয়ের ফাঁসী হবে। একটা বিচিত্র সহানুভূতিতে তারা যেন ম্রিয়মাণ বিমর্ষ। মধ্যে মধ্যে অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস সবার বুক থেকেই বেরিয়ে আসবে। 'এ' ক্লাসের আসরে পলিটিক্যাল প্রিজনারদের আসরে, ইণ্টেলেকচুয়াল বা পলিটিক্যাল তর্কও যেন ভিজে-ভিজে হয়ে উঠছে। জেলের মধ্যে একা একা যারা রয়েছে তাদের মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি পাক খাচ্ছে—গর্তের সাপের মত। বুকের মধ্যে নিশ্বাস ফেলতে যেন একটা উদ্‌বেগের অনুভূতি অনুভব করছে।

কনডেম্‌ড্‌ সেলের মধ্যে বিহঙ্গিনী, না—সুচন্দ্রা—এলোমেলো চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ একেবারে-ভুলে-যাওয়া অথবা মন-যা-ভুলে-যেতে-চায় সেই স্মৃতির ছিপি-আঁটা বোতলটার ছিপি খুলে ফেলেছে। অবাঞ্ছিত 'মন-যা-ভুলে যেতে চায়' সেই স্মৃতি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত বের হচ্ছে। চোখের সামনে স্বরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

সে বারণ করছে। না—না। এ চিন্তা দূরে যাক—দূরে যাও। ধোঁয়া হয়ে আছে ধোঁয়া হয়ে থাক—মিলিয়ে যাও। কিন্তু সে তা শুনছে না—শুনবে না। দীর্ঘকাল বোতলের মধ্যে বন্দী ক্ষুব্ধ দৈত্যের মত বিকট আকার নিয়ে সামনে দাঁড়াচ্ছে।

ওঃ, দেখতে চায় না সে। মুখের উপর এনে ফেলা রুক্ষ এলো চুলের রাশকে দুই হাতে ধরে প্রাণপণে টানল সে।

তবু মনে পড়ে। মনে পড়ে পার্থ মুখার্জীকে। পার্থ মুখার্জী। বিচিত্র পার্থ মুখার্জী। বুদ্ধিবাদী অতি-আধুনিক—সেই দলের বা জাতের যাদের কাছে শুধু বুদ্ধি আছে বোকামি আছে—হৃদয় নেই। প্রয়োজন হার্ট নামক যন্ত্রটির—হৃদয়ের নয়। পার্থ আর্টিস্ট—গানের আর্টিস্ট। আলট্রা মডার্ন। নিজের স্কুল গড়ছে এদেশে। বিলিতী সুর—বিলিতী সব। নেহাত রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ফেলতে পারে না—বা কিছু নয় বলতে পারে না ভয়ে। বাদ বাকী সব তার কাছে রাবিশ।

রোগা খাটো মাথার মানুষ। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। মডার্ন যুগের ছাঁকা ছাঁকা কথা। গান্ধীজীকে বলে—বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধ ফিলজফির ব্যর্থতার প্রতীক। স্বাধীনতাকে বলে—'রাম নাম সত্‌ হ্যায়, মার্কা শেষ খাওয়া খেয়ে নেওয়ার অবাধ অধিকার। কমুনিজিমকে বলে—উইপোকা সিভিলিজেসন। অথবা ইমিটেশন অফ উইপোকা রাজত্ব।

গানের জগতে সে বিপ্লব আনতে চেয়েছিল। এ দেশের পুরানো ধারাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে ইয়োরোপের সুর ইয়োরোপের গান—ইয়োরোপের সব। নাচ-বাজনা সব। ইয়োরোপের ব্যালের উপর একটা নেশা ছিল পার্থের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার—তার নিজের গলা

ছিল মেয়েলী। হাত-পা নাড়ার মধ্যেও মেয়েলী ঢঙ ছিল। চেহারাটাও ছিল তাই। লম্বায় পাঁচ ফুটের দাগ ছাড়ায়নি।

পিছন থেকে ষোল-সতেরো বছরের ছেলের মত দেখাতো। তাই এখনও দেখায়। তবে কুঁজো হয়ে গিয়ে থাকবে।

বিভাসকে সে যেচে বিয়ে করেছিল। এককালের স্বামী।

বিভা। হ্যাঁ' তখন তার নাম বিভা। এক নাম-করা ব্যবসায়ীর প্রণয়িনীর কন্যা। স্বামী স্ত্রীর মতই বাস করেছেন তাঁরা চিরদিন কিন্তু তবু তাঁরা বিবাহিত বলে দাবি করেননি। ব্যবসায়ীর সম্পত্তি তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর ছেলেরাই পেয়েছিল। বিভাকে তিনি স্কুলে পড়িয়েছিলেন। সেখানে বাপের নাম ছিল তাঁরই নাম।

মণিলাল সেনের মেয়ে বিভা সেন। বিভার কোন ভাল ছেলের —বিভার মতই যার জন্ম-পরিচয়—সঙ্গে বিয়ে দেবেন, কিছু একটা করেও দেবেন ভেবেছিলেন। বিভা ম্যাট্রিক পড়ার সঙ্গে গানবাজনা শিখেছিল। মায়ের কণ্ঠস্বর পেয়েছিল—হাতেখড়িও নিয়েছিল মায়ের কাছে। তারপর ওস্তাদের কাছে। তখন দেশে নতুন বাংলা গজলের চলতি হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের গানের মধ্যে দিয়ে। তার সঙ্গে—অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। বিভা নজরুল ইসলাম এবং অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে তখন অল্প অল্প নাম করেছে। তখনই একদিন পার্থের সঙ্গে দেখা হল এবং সংঘর্ষও হল একটা।

পার্থের তখন খ্যাতি অনেক। সে খ্যাতির একটি বিশেষ স্বরূপ আছে। এক এক ধরনের খ্যাতি আছে যার ধ্বনি উচ্চ কিন্তু মানুষ তাকে সমীহ করে, কাছে যায় না। উল্টে খ্যাতি যদি কাছে আসে, মানুষ দূর থেকে নমস্কার করে সরে যায়। পার্থের বিলীতী গান থেকে নেওয়া সুর তাদের ভাল লাগে না, তার উপর তার সরু মেয়েলী গলা শুনে তাদের মন যেন বিষিয়ে ওঠে। তবু নতুনের একটা হাঁক-ডাক আছে, আস্ফালন আছে, নবজাতক যেমন চীৎকার করে কেঁদে জানান দিয়ে আসে—তেমনিভাবে আসে। পার্থর নতুনত্বই তাই এসে ছিল। বুদ্ধিবাদীদের মহলে শোর উঠেছিল। কাগজে কাগজে স্বাগতও জানিয়েছিল তাকে গ্রামোফোন কোম্পানী তার গানের খানকয়েক

রেকর্ড'ও বের করেছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই শোর থামল। কাগজেরা চুপ করল। রেকর্ড'গুলোর প্রত্যেকটা একশো একশো-পঁচিশের বেশি বিক্রি হল না। কিন্তু পার্থের খ্যাতির রঙ তখনও চটেনি বা ইমেজটায় যে সরু চুলের মত দাগ দেখা দিয়েছিল সেগুলো ফাটলে পরিণত হয়নি। একটা সম্ভ্রম তখনও তার আছে। একটা গানের আসরে সে উপস্থিত ছিল—বিভা গাইতে এসেছিল। পার্থ মুখুজ্যে আসরে আছে শুনে বিভার কৌতূহল হয়েছিল এবং সে বেশ পরিশ্রম ও যত্ন করে গান গেয়েছিল—পার্থের সার্টিফিকেটের জন্য। কিন্তু পার্থ অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিল—রাবিশ।

* * *

ম্যাট্রিক পাস করেছে সবে। গানে নাম হচ্ছে। সেদিন আসরে কাজী নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই, ফুল শাখাতে, দিসনে আজি দোল' গানখানা গেয়ে খুব হাততালি পেয়েছিল। গানের শেষে উদ্যোক্তাদের সঙ্গ ধরে অটোগ্রাফের খাতা এসেছিল পার্থের কাছে। পার্থ সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ ছাড়ছিল। সে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি তো গজল গাইলে ? এঁ্যা।

সলজ্জিত এবং ঈষৎ পুলকিতভাবেই সে বলেছিল—হ্যাঁ। তবে মনটা তার খুঁতখুঁত করছিল—পাথের চেহারা ভঙ্গি এবং বেশভূষা দেখে। সব কিছুর মধ্যে যেন একটা ন্যাকামি এবং বিশ্রীপনা ছিল।

পার্থ বলেছিল—চমৎকার মেয়ে তো তুমি। সুন্দর। কিন্তু এ সব গান কেন গাও ? তারপর ধোঁয়ার ক'টা রিঙ ছেড়ে অটোগ্রাফের খাতায় পাতা-জোড়া সই মেরে দিয়ে বলেছিল—গান তোমার ভাল হয়নি। গলার কোন মার্জনা হয়নি। কেমন জানো ?—পার্থের কথা মধ্যে মধ্যে বেঁকে যায়। সম্ভবত চাল বা স্টাইলের জন্যে।—ভয়েসটার সুইটনেসটা নষ্ট করছে—। ওই—যে—এ দেশী ওস্তাদ-গুলো একটা আর-টি-ফি-সিয়াল গলা তৈরী করে—।

বলে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বুঝেছ ? 'ঝ'য়ের উপর খটখটে কড়া ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করেছিল। তার একটা ক্রিয়া

আছে একথা বলতেই হবে। বিভার গায়ে লেগেছিল। যেন এক অঞ্জলি কাদার মত নরম অবজ্ঞা তার গায়ে ছপ করে ছুঁড়ে মেরেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বিভা তার উত্তর দিয়েছিল,—ওই চড়া ঝোঁকে 'ঝ' এবং 'ছ' উচ্চারণ করে—বলেছিল—'বু-ঝে-ছি।'

এটুকু প্রখর প্রগল্‌ভতা বিভার গোড়া থেকেই ছিল। হয়তো বা মায়ের দিকে সংস্কার সংস্কৃতির কোথাও ছিল।

উত্তরে ঠিক তেমনি উচ্চারণ করে—পার্থ তাকে বলেছিল—বু ঝে ছ! তাতে আমি আনন্দিত।

সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—মেয়েটির মধ্যে ছিল কিছু হে। কিছু কেন বেশ কিছু কিন্তু মার্জনা হল না। Culture হল না। ফলে পুরনো থেকে গেল। গ্রামীন থেকে গেল।

তারপর সিগারেটের ধোঁয়ায় পর পর তিনটে রিঙ ছেড়ে বলেছিল Rural Production-এর মধ্যে টাটকা সবজি—জ্যান্ত মাছ—এবং মিহি চাল আমি সত্যি করে ভালবাসি। গানের ক্ষেত্রে যখন বাউল সুর এসে গাবগুবাগুব বাজিয়ে ধপাং ধপাং করে নাচে—তখন আমার ইচ্ছে হয় আমি কিছুক্ষণের জন্যে মরে যাই।

অত্যন্ত ক্ষুন্ন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছিল বিভা! এ পর্যন্ত এমন রূঢ় এবং বিশ্রী ভঙ্গিতে কেউ তাকে আঘাত করেনি।

কিছুদিন পর একটা মিউজিক কম্‌পিটিশনে সে যোগ দিয়েছিল। সেখানে বিচারকদের মধ্যে ছিল পার্থ। নিজের ক্ষেত্রে গজলে রাগপ্রধান সঙ্গীতে সে প্রথম হল, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটা সে পেলে না পার্থের জন্যে। সে তাকে এ ক্ষেত্রে শূন্য দিয়েছিল।

একবার নয়, আরও কয়েকবার ঘটেছিল এমনটা, যার ফলে বিভার আক্রোশের শেষ ছিল না।

* * *

আশ্চর্যভাবে একদিন এল শোধ নেবার সুযোগ এবং সেই সুযোগে বিভা সাধ মিটিয়ে তুললে এর শোধ।

সুযোগটা পার্থ নিজে ডেকে এনে তার সামনে ধরেছিল—না

বিধাতা তার বিচিত্র বিশাল চক্রটি চালনার মুখে তারই টানে এনে দিয়েছিলেন—তা কোনদিন বিভা ভেবে দেখেনি। আজ এই মুহূর্তেও সে ভেবে দেখছে না বা দেখার মত মনের সচেতনতাও নেই।

মনে পড়েছে শুধু ঘটনার কথা।

www.boiRboi.blogspot.com

পার্থ একটা গানের আসরের অনুষ্ঠান করেছিল। রীতিমত টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান। একটা মাঝারি হল ভাড়া করে সাজিয়ে গুজিয়ে আয়োজন করেছিল। নাম দিয়েছিল 'আগামী কালের সঙ্গীত'। একটা বক্তৃতা লিখে পড়েছিল সে।

বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি এবং ঢলঢলে পাঞ্জাবী পরে তাকে বিশ্রী বেমানান লাগে, সে কথা সে জানে, তবু সেই তার পোশাক। সেই পোশাকে বক্তৃতা শেষ করলে। লোকে—বিশেষ করে একদল ছেলে—পা ঘষলে, শিষ দিলে। একটা বিশেষ অংশ এদেশের ক্লাসিক্যালের প্রতি তার বিরূপ মন্তব্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। এরপর আরম্ভ হল 'আগামী দিনের গান'।

এক দেশের কান সব দেশের গান তখনই ধরতে পারে বা বুঝতে পারে—যখন সব গানের উৎস যে গানটি সেই গান সম্পর্কে তার পরিচয় থাকে। সে-কান শ্রোতাদের কম লোকেরই ছিল। এবং পার্থের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সব দেশের গান-গাওয়ার মত জন্মগত-গাইয়ের গলা কারুরই ছিল না। বিদেশী সুর শ্রোতাদের অনভ্যস্ত কানে মিষ্ট লাগেনি; তার উপর বেসুরো হয়ে রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। ফলে গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

এর ফলে একটি মেয়ে, কোরাসের দলে যে মধ্যবর্তিনী হয়ে গান গাইছিল সে এমন চঞ্চল ও ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ার মত নিচে নেমে গেল। গোড়া থেকেই কাটা বিরূপ মন্তব্য ছোট ছোট ঢিলের মত এদিক ওদিক থেকে এসে পড়েছিল, এবার মধ্যবর্তিনী মেয়েটির এই শোচনীয় ব্যর্থতায় লোকে হো হো করে হেসে উঠল। একটা থান ইট নিক্ষিপ্ত হল বললেই ঠিক হবে। সঙ্গে সঙ্গে কেউ জানোয়ারের ডাক ডেকে উঠল। সে একটা তাণ্ডবের উপক্রম। মেয়েরা

স্টেজের উপর বোবা হয়ে গেল। দু-চার জনের চোখে জল এসেছে। দর্শকদের একদল দাঁড়িয়ে উঠেছে। এবং চীৎকার করে বলছে; যা বলেছিল—তা অশ্রাব্য।

অন্য সময় হলে সে অশ্রাব্য শব্দগুলো মনে মনে স্মরণ করে হয়তো হাসতো সুচন্দ্রা। কিন্তু আজ হাসি এল না। কাল ভোরে তার···।

সব থেমে গেল।

মনটা শূন্য ফাঁকা হয়ে গেল সুচন্দ্রার। কানেও কোন শব্দ আসছে না। চোখেও কিছু পড়ছে না। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে থেকে তাকে যেন দেখা যায়। সে-আলোয় সন্ধ্যেবেলা টিক্‌টিকি আর পোকাদের খেলা দেখা যায়। সেই ভয়ংকর খেলা—। মরণের শিকার খেলা। আজও টিক্‌টিকিটা রয়েছে একটা কোণে। স্থির হয়ে দেওয়ালে লেগে রয়েছে। আলোকিত চুণকাম-করা দেওয়ালে ছোট পোকা বসছে—উড়ছে, এ ওর প্রতি ধাওয়া করছে। সুচন্দ্রা এর অর্থ জানে। পুরুষটা ধাওয়া করছে মেয়েটার দিকে। কালও এ কথাটা তার মনে পড়েছিল; কালও সে হেসেছিল। এর এই অর্থ তাকে পার্থই একদিন বুঝিয়েছিল।

শূন্য ফাঁকা নিস্তরঙ্গ মনে আবার স্মৃতির ছবি নড়ে ওঠে। সুচন্দ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। পার্থ এসে দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের উপর। হাত জোড় করে বলেছিল—আপনারা চুপ করুন। সকলে মিলে কোলাহল করলে তো গান শোনানো যায় না।

কে এক উদ্ধত তরুণ বলেছিল—গান? ওই বেসুরো চীৎকার নাকি?

পার্থ যত নার্ভাস তত সে উদ্ধত হয়ে ওঠে বাইরের প্রকাশে। সে বলেছিল—গান নয়? গান বোঝেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। এবং উদ্ধত তরুণটি লাফ দিয়ে গিয়ে উঠেছিল স্টেজের উপর। পিছনে পিছনে আরও ক'জন। পিছনের ক'জনের মধ্যেই জন দুই ছিলেন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তাঁরাই সেদিন তরুণটির মুঠো থেকে পার্থের গলার চাদর ছাড়িয়ে নিয়ে স্টেজ থেকেই দর্শকদের বললেন ; 'বসুন আপনারা। বসুন। গান হবে। ভাল গানই হবে। তবে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।'

একজন খ্যাতনামা গায়ক নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রজনী ঘোষ। বিভার রজনীদা। তাকেই ডেকে বসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা মাইকের সামনে।

রজনী ঘোষই বিভাকে ডেকে স্টেজে তুলে ছিলেন। বিভা (তখন সুচন্দ্রা নয়) টিকিট কেটেই পার্থের এত বিজ্ঞাপনের ঢাক-পেটানো বিলিতী সুরে বাংলা গান শুনতে এসেছিল। হলে ঢুকবার মুখে দৈবক্রমে রজনীদার সঙ্গে দেখাও হয়ে গিয়েছিল। রজনীদা নিজের গান শেষ করে স্টেজ থেকে নেমে এসে তার হাত ধরে বললেন—এস—তুমি এস দেখি। লোকটার মাথাটা তো বাঁচাতে হবে। এস।

—আমি যাব ?

—হ্যাঁ গো। তুমি। দাওতো আসরটাকে একটু মাতিয়ে। বড্ড তেতে গেছে। মিষ্টি জোরালো গলায় ধরো তো কাজী সাহেবের গজল একখানা, তারপর অতুলপ্রসাদ একখানা। দেখ না, ম্যাজিক হয়ে যাবে।

হয়তো পার্থকে খোঁচা দিয়েই বলেছিলেন। কারণ দেশী গানকে পার্থ যতখানি অবজ্ঞা করত তার থেকেও আরও বেশি অবজ্ঞা করত নবীন কালের গীতিকারদের গানকে। এবং বিভা তাতে যেন জোর পেয়েছিল মনে। পার্থ তাকে যে অবজ্ঞা এবং ক্ষেত্রবিশেষে হেয় করতে চেয়েছে তার একটা শোধ তুলবার মস্ত সুযোগ যেন বিধাতা তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল তার। সে-সুযোগের ষোল আনা সদ্-ব্যবহার সে করেছিল। তপ্ত আসরকে শান্ত করে সত্যিই সে মাতাতে পেরেছিল। বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের গান সে আশ্চর্য জমাট এবং সুন্দর করে গেয়েছিল। পর পর পাঁচ খানা গেয়েও সে রেহাই পায়নি। শ্রোতারা এমন জোরালো অনুরোধ করেছিল যে, সে অনুরোধ তাকে রাখতেই হয়েছিল। কাজী সাহেবের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' আর অতুলপ্রসাদের 'কে আবার বাজায় বাঁশী

এ ভাঙা কুঞ্জবনে'—এ দু'খানা গান তার এত ভাল হয়েছিল যে, এর খ্যাতি মাস কয়েকের মধ্যেই গিয়ে পেঁাছেছিল গ্রামোফোন কোম্পানী অফিস পর্যন্ত।

www.boiRboi.blogspot.com

ভারী দু-জোড়া জুতোর শব্দ এসে থেমে গেল তার সেলের সামনে। বিহঙ্গিনী দরজার দিকে পিছন ফিরে বলেছিল। তার চিন্তার ধারা দাঁড়াল। হ্যাঁ, দাঁড়াল। কাটল না। যারা এসে দাঁড়াল সেলের সামনে তাদের উপরেই বিরক্ত হয়ে দাঁড়াল। গভীর চিন্তামগ্ন মানুষের সামনে কোন আগন্তুক এসে দাঁড়ালে যেমন হয় ঠিক তেমনি। চিন্তাটা থমকে দাঁড়ায় মাত্র। মানুষটা যেমনি চলে যায় অমনি আবার চিন্তা চলতে শুরু করে।

সে জানে কেন এসেছে। তদারক করে দেখতে এসেছে সে ঠিক আছে তো। এই সময়ে সে হার্ট-ফেল করলেও তো জেলের কর্তৃপক্ষের বিপদ।

জুতো আবার চলতে শুরু করলে। বিভা বা সুচন্দ্রা বা বিহঙ্গিনীর চিন্তাও নতুন করে চলতে লাগল।

গ্রামোফোন কোম্পানীর লোক যখন এসেছিল—তখন সে পার্থকে বিয়ে করেছে।

ওই বিচিত্র ঘটনাটা থেকেই বিয়েটা ঘটেছিল।

আসরের শেষে পার্থ এসে মাথা নিচু করে এক ধরনের বোকা-বোকা বা অপ্রতিভ-হওয়া হাসি ঠোঁটে মেখে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর বলেছিল—কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে বিভা—ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সেটা সহজে উচ্চারণে কথা বলেছিল। কণ্ঠস্বর ছিল মেয়েলী ও মিষ্টি—তার সঙ্গে আন্তরিকতার রেশ মিশে বড় ভাল লেগেছিল।

ডি এল রায়ের গান আছে—'ওই সুধা সিন্ধু উথলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে'। ঠিক তাই মনে হয়েছিল। এত খুশী সে কখনও হয়নি।

তখনও সে পূর্ণ-যুবতী নয়। তখনও তার কৈশোরের স্বপ্নের রেশ চোখ থেকে মুছে যায়নি। এমন দিনে পার্থ তার কাছে মিনতি

করে ক্ষমা চাইলে। হার মানলে। সে এত মিষ্টি লেগেছিল যে পৃথিবীতে যত কিছু শ্রেষ্ঠ মিষ্ট স্বাদের স্মৃতি তার মনে পড়ছে তার মধ্যে এর সঙ্গে তুলনা কোনটিরই আর হয় না।

সে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বলেছিল—না-না-না। ওরা তো বিলিতী গান বোঝে না—তাই এমন বেরসিকের মত গোলমাল করছে। আর মেয়েটি বেসুরো হয়েছিল বেজায়। অর্কেষ্ট্রার সময় তো গোলমাল করেনি।

পার্থকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই সে কথাটা বলেছিল।

পার্থ বলেছিল—আবার তোমাকে ধন্যবাদ বিভা! তুমি বুঝেছ। দেখ, তুমি যদি শেখ তবে তোমাকে আমি ওয়েস্টার্ন মিউজিক শেখাব। শি-খ-লে তখন বুঝবে কি আশ্চর্য গান ওদের। তোমার মত যদি ছাত্রী পাই—তাহলে—। কাতর মিনতি ফুটে উঠেছিল তার চোখে।

সে বলেছিল—ওস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করবো।

—ওস্তাদজীকে? কেন?

কথাটা অর্ধ-সত্য বলেছিল। এক কথায় রাজী হতে ইচ্ছে হয়নি। এর ফলও পেয়েছিল। ক্রমাগত অনুরোধ আসতে শুরু করেছিল—পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ পার্থ মুখুজ্যের কাছ থেকে।

জীবনে সে এক নতুন স্বাদের আস্বাদন।

আশ্চর্যভাবে এর সঙ্গে মিশে গেল আর একটা স্বাদ।

গানের গলার সঙ্গে পার্থ একদিন তার রূপের প্রশংসা করলে। পার্থের সে চিঠিখানা তার কাছে আজও আছে। এখানে নেই, বাড়িতে তার গহনার বাক্সের তলায় গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে রাখা আছে। 'তোমার রূপের শিখায় আমাকে পতঙ্গেরমত ঝাঁপ দিয়ে পাখা পুড়িয়ে মরতে দাও বিভা। অথবা ভুল বললাম তোমার রূপ প্রদীপের শিখা নয়—চাঁদের আলো। তুমি চাঁদ। চন্দ্রা তোমার নাম! তুমি চন্দ্রা—না, তার থেকেও সুন্দর—তুমি সুচন্দ্রা। বিভা নয়।'

তারপর কিছুদিন পার্থের সঙ্গে তার সঙ্গীত-সাধনা কপোত-কপোতীর গুঞ্জনের মত। তারই মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল

বিভা। বিভা নয়, সুচন্দ্রা। পার্থ তাকে আদালতে এফিডেবিট করিয়েছিল যে সে আর বিভা নয় অতঃপর সে নাম নিলে সুচন্দ্রা। সেই নামেই রেজিষ্টী করে বিয়ে হয়েছিল পার্থের সঙ্গে। মা বাপের সম্মতি না নিয়েই। তখন গ্রামোফোনে তার রেকর্ড বের হচ্ছে। পার্থের রেকর্ড হয় না—তার হয়। বয়স আঠারো পার হয়েছে। পার্থ তাকে মহারাণী সম্বোধন করে সকাতরে তার মালঞ্চের মালাকার হতে চেয়েছে। পরাজিত এই অহঙ্কারীটির স্বাদ সেদিন বড় মধুর ঠেকেছিল এবং তারই আকর্ষণে সে ব্রাহ্মণের মেয়ে না হয়েও ব্রাহ্মণ পার্থকে বিয়ে করবার জন্যে বাড়ির সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন করে চলে এসেছিল। মা-বাপ বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কিছু করতে পারেনি। পার্থের থেকে উদার এবং গণীজন পৃথিবীর মধ্যে আর কেউ ছিল না তার কাছে। সে বিবাহিত বাপ-মায়ের সন্তান নয় জেনেও পার্থ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—সেইটেই তাকে অভিভূত করেছিল। একখানা ঘরের একটা বাসা ছিল পার্থের। সেখানা ছেড়ে দিয়ে প্রথম এসে উঠেছিল হোটেলে। কয়েকজন বান্ধব-বান্ধবীকে নিয়ে হয়েছিল বউ ভাত। সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল পার্থ। সে মাথায় কাপড়ের আঁচল টেনে ঘোমটা দিয়ে বউ সেজে বউ ভাতের প্রথম দফা খাবারের পাত্রটা নিয়ে সকলকে পরিবেশন করেছিল।

সে স্মৃতি মনোরম স্বপ্ন-স্মৃতির মত মনে হচ্ছে আজ।

সুচন্দ্রার মন সেই স্বপ্ন-স্মৃতিটিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ফেলে যাচ্ছে না।

মনোরম করে সাজানো টেবিল। ফুলের সম্ভার। সন্ধ্যার পর আটটার সময় খাওয়া। উজ্জ্বল আলো। ফুলের তোড়া ফুলের সাজি ফুলের মালা। ডিনার টেবিলের উপর বিছানো চাদরখানার রঙ ছিল আশ্চর্য উজ্জ্বল। তার উপর গোলাপ, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম গাঁদা লিলির সমারোহ।

এ সবই হয়েছিল পার্থের চিত্রশিল্পী বন্ধু সুরেনের রুচি মত এবং নির্দেশ মত। সেই দিনই আলাপ হয়েছিল সুরেনের সঙ্গে।

সুরেন তাদের বিয়ের সাক্ষী। সুরেন পার্থের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পার্থ তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিল—আমার বন্ধু সুরেন। আর্টিস্ট সুরেন রায়। নাম শুনেছ নিশ্চয় ? আমি বলেছি কতবার। ভাল আর্টিস্ট, কৃতী লোক, অনেক রোজগার করে। তার সঙ্গে অত্যন্ত মডার্ন এবং হৃদয়বান। অন্ততঃ আমার পক্ষে। সব থেকে বড়, সুরেন হল রসিক জন। আর সুরেন, ইনি সুচন্দ্রা, আমার নব-বিবাহিত পত্নী, যে বিবাহের সাক্ষী তুমি—রূপ তুমি চোখেই দেখেছ। গুণের পরিচয়ও পাবে। এবং প্রত্যাশা করি তুমি মুগ্ধ গুণগ্রাহী হয়ে উঠবে ; হয়তো আজই উঠবে। চমৎকার কণ্ঠস্বর। সুন্দর গান গায়। এবং সেও অত্যন্ত মডার্ন। রীতিমত শিক্ষিতা।

সুরেন গম্ভীর মানুষ। শক্ত সরল মাথায় লম্বা লোকটির দৃষ্টি দেখে তার মন কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল। কেমন যেন একটা বেশি গাম্ভীর্য, যা দেখে মন পিছিয়ে আসে। কেমন যেন ভারী মানুষ।

সুরেনের মুখে হাসিও সুলভ নয়। তবু তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সুরেন বলেছিল—ওঁর গানের কথা শুনেছি। আজ নিশ্চয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে প্রচুর তৃপ্তি পাব। রূপের প্রশংসা করব না, শুধু বলব—তোমার সৌভাগ্যে আমি ঈর্ষান্বিত।

সে এতক্ষণে খুশী হয়ে লাল হয়ে উঠেছিল। কান-গাল গরম হয়ে উঠেছিল মনে পড়ছে।

পার্থ বলেছিল—শোন শোন সুচন্দ্রা, সুরেন কি বলছে শোন। তা তাই তুমি একখানা অয়েলপেনটিং এঁকে নাও। এবং সেটা তোমার নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলে বসে কথা চলছিল। দশ-বারো জনে মিলে ডিনার। টুকরো টুকরো উজ্জ্বল মিষ্ট কথা রৌদ্র-ঝলমলে দিয়ে সাবানের ফেনার রঙীন ফানুসের মত শূন্যলোকে ভেসে উঠে ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সে সবের কিছুই মনে নেই। হয়তো আছে। চেষ্টা করে মনে করলে মনে পড়তে পারে, কিন্তু সে-মন নেই।

মনে রয়েছে সুরেনের কথা।

সুরেনই ছিল সেদিনের আসরে সবজনের মধ্যে উজ্জ্বল মানুষ, সচ্ছল মানুষ, সব থেকে গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সুরেনই তা জীবনের ক্ষেত্রে দামী এবং মজবুত জুতো পরে পদচিহ্ন এঁকে হেঁটেছে পরবর্তী কালে। মনে পড়ছে তারই কথা। আজ এইখানে তাকে যারা টেনে এনেছে সে তার মধ্যে একজন। সে তাকে আকর্ষণ করেছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

না-না। মুগ্ধ হয়েছিল তা বলছে না সে। বরং তার ওই পৃষ্ঠ-পোষকসুলভ কথাগুলো ভালো লাগেনি। ভুরু কুঁচকে উঠেছিল তার। একবার ভেবেছিল বলবে না, গান আজ গাইতে পারব না। গলাটা কেমন ধরা-ধরা হয়ে আছে। প্লিজ, আজ না। অন্যদিন।' কিন্তু ও ভাবনা পাল্টে ফেলেছিল। এবং খুব যত্ন করে গান গেয়ে শুনিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। খুব ভাল বিলিতি সুরে বাংলা গান সুন্দর করে গেয়েছিল।

সকলেই তারিফ করে হাততালি দিয়েছিল। সুরেনও দিয়েছিল। কিন্তু হাততালির শেষে বলেছিল—এ তো বিলাতী খানার সঙ্গে খাপখাওয়া গান হল, চমৎকার হল। ওয়েডিং ফীস্ট। ডিনার টেবিল। এখন বাংলা বাসরের গান বউ-ভাতের সঙ্গে সুক্তো ডাল্‌না জাতের চেনা গান শোনাতে পারেন? শুনেছি তো অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুল এসব আপনি খুব ভাল গাইতে পারেন।

পার্থ জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ, তা গাইত। কিন্তু আর গায় না।

সুচন্দ্রা তখন পার্থের শিষ্যা এবং প্রিয়সখী হয়ে নতুন জীবনে পৌঁচেছে। সে—বলেছিল—কেন, বিলিতী সুর আপনার ভাল লাগে না?

সুরেন বলেছিল—লাগে না বলছি না। আপনার গানই খুব ভাল লাগল। আমার কালেক্‌শনে বিলিতী রেকর্ড দেশীর চেয়ে বেশি, তা না। বলছি রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুল কেমন নাড়ীর টান আছে।

এবার সম্ভবতঃ অত্যধিক গোঁর বোধে পার্থ কথা বলার সেই বাঁকা উচ্চারণের বাঁকে এসে পড়েছিল। বাঁকা উচ্চারণে বলেছিল—তা হলে একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে দাও—সুচন্দ্রা। সুরেনের অনুরোধ। এবং আজকের দিন। কি বলো সুরেন?

'দে লো সখি দে, পরাইয়ে গলে—সাধের বকুল ফুলহার। মনে পড়ছে গানখানা।

রাত্রের বাসর-শয্যায় তাকে খাটে বসিয়ে পার্থ বলেছিল—দাঁড়াও। আমি তোমার মালাকার। তোমাকে ফুলের গহনা পরিয়ে সাজাব। সাজিয়ে বলেছিল—বিবাহের চেয়ে বড় আমাদের মিলন। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

সে তাকে কাছে টেনেছিল। আচমকা টানে তার হাতের ব্যাগটা খসে মেঝেয় পড়ে গিয়ে খুলে গিয়েছিল। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল প্রেজেণ্টগুলো। সোনার প্রেজেণ্ট! দামী প্রেজেণ্ট। তার মধ্যে ছিল টাকা। সুরেন একশো টাকার নোট দিয়েছিল। বলেছিল—পছন্দমত কিছু কিনে নেবেন। সেগুলোকে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়েছিল।

* * *

ঢং ঢং।

ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠল সুচন্দ্রা।

আশ্চর্য! এর মধ্যেও ক্লান্তি মানুষকে ঘুমে আচ্ছন্ন করে। চোখ ভরে ঘুম আসে। এসেছিল ঘুম।

ঢং ঢং ঢং।

ক'টা বাজছে? নটা বা দশটা। তার বেশি হবে না। ঘুমিয়ে গিয়েও সে ঠিক ঘুমোয়নি। দেহ তার স্থির নিথর। ঘুমও। কিন্তু মন জেগে আছে। স্বপ্নের মত জীবনের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা; বাইরের উচ্চ শব্দগুলো কিন্তু কানে আসছে। তার সঙ্গে আবছা আবছা মনে রয়েছে—কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই—। ঘুমের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ছে, কিন্তু চঞ্চলতা অস্থিরতা সব শান্ত হয়ে গেছে।

ঢং-,ঢং-,ঢং,-ঢং।

সাত না আট?

ঢং-ঢং-ঢং?

ক'টা হল—দশ না এগারো?

হিসাব করার শক্তিটুকু ঘুমিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মত বা স্বপ্নের মধ্যে বিহঙ্গিনীর মনে পড়ে—সুরেন তাদের জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য, বাস্তব বিষয়বাদের রাস্তায় চলতে চলতে বারবার দেখা হতে লাগল তার সঙ্গে। সুরেন থিয়েটারে নাটকের সেট তৈরি করে। ছবিতে শিল্পীর কাজ করে। মধ্যে মধ্যে তাদের ওখানে আসত। পার্থ নেমতন্নও করত।

প্রথম সে জানত না। পরে জানল যে, পার্থ মধ্যে মধ্যে তার কাছে টাকা ধার করে। জানলে একবার বাড়ী-ভাড়া দেবার সময়। সুরেন সেদিন এসে—পার্থকে নোটের বাণ্ডিলটা দিচ্ছে এই সময়ে সে এসে পড়েছিল। সুরেন অপ্রস্তুতের মত একটু হেসেছিল। পার্থও এক বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল—সুরেনের মত বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই সুচন্দ্রা। আর ও যে তোমাকে কি ভালবাসে কি বলব? জানো, বাড়ী-ভাড়া বাকী পড়েছে—পাঁচ মাসের। বাড়ীওলা নালিশ করবে বলে নোটিশ দিয়েছে। সুরেনকে বললুম, সুরেন, সুচন্দ্রার গহনা রেখে আমার ভাই এক হাজার টাকা ইমিডিয়েটলি চাই, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও। বাড়ীওলা উঠিয়ে দেবে। নালিশ করবে। সুরেন বললে—না। আমি টাকা দেব, তুমি সুচন্দ্রা দেবীর গহনা বাঁধা দিয়ো না। টাকাটা এনে দিলে এই দ্যাখো!

শরীরটা তার ঝিম ঝিম করে উঠেছিল।

সুরেন বলেছিল—কি সব বাড়িয়ে টাড়িয়ে বল পার্থ। টাকা আমার রয়েছে হাতে। আর আমি চেষ্টা করছি—সুচন্দ্রা দেবীকে যাতে প্লে ব্যাকে নেয়-টেয়—

—তাই করো সুরেন। তাই করো! আমি আর পারছি না ভাই।

সুরেন; আবার তার স্বপ্ন থমকে দাঁড়াল। ঘুমের ঘোরটা পার হয়েছে। কিছুটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। —এটা আসছে ওটা আসছে। কি যেন? ইলিশ মাছ। সুরেন ইলিশ মাছ হাতে হাসি মুখে ফ্ল্যাটে ঢুকছে। একখানা দামী শাড়ী।

* * *

এরই মধ্যে নতুন মোটরকার একখানা। মেরুন রঙের।

গাড়ীতে বসে আছে সুরেন আর সে। গাড়ীখানা চলছে। নতুন গাড়ী কিনেছে সুরেন। ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে চলেছে। পার্থ আগেই সেখানে চলে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

সুরেনকে চঞ্চল মনে হচ্ছিল। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল। আর বার বার জিজ্ঞাসা করছিল—গাড়ীখানা কেমন হল বল!

তখন দুজনেই দুজনকে 'তুমি' বলে।

সে বলেছিল—খুব ভাল। সুন্দর হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ গাড়ী কিনলে?

—কিনলাম কেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—এই আজকের জন্যে? তোমার জন্যে।

—মানে?

—তুমি বলেছিলে—ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে ইচ্ছে হচ্ছে—এবং মোটরে করে যেতে ইচ্ছে করছে—আমি বলেছিলাম—আমি ব্যবস্থা করব।

—হ্যাঁ, তোমার কোন্ বড় ক্লায়েণ্ট ফার্মের গাড়ী নেবে বলেছিল—

—বলেছিলাম। ওরা দেবে বলেছিল কিন্তু হঠাৎ বললে দেবে না। তোমার কাছে মুখ দেখাব কি করে? কিনলাম গাড়ীটা। ছ'মাসের পুরনো মাত্র। আমি নতুনের দাম দিলাম।

অবাক হয়ে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কি দেখতে চেয়েছিল? তা তো মনে হচ্ছে না। তবে এমন ক্ষেত্রে সকলে তাকায় সে-ও তাকিয়েছিল।

হেসে সুরেন বলেছিল—বিশ্বাস হচ্ছে না?

এবার সে হেসে ফেলেছিল।—অবিশ্বাসের কি আছে?

আমি সন্তর্পণে তার হাতের উপর সুরেন নিজের হাতখানি রেখেছিল। সে হাত সরিয়ে নেয়নি। যে মানুষটা তাকে খুশী করবার জন্যে একখানা গাড়ী কিনে ফেলতে পারে তাকে এটুকু প্রসাদ না-দিলে অন্যায় হবে। তা ছাড়া সুরেন একটা ভারী ওজনের

মানুষ। অর্থ আছে। গাম্ভীর্য আছে। ব্যক্তিত্ব আছে। তার নিজেরও কেমন যেন ছোট মনে হত লোকটির কাছে। উপকারী উপকৃত সম্পর্ক ছাড়া মনে হত। বয়সে বড়োর যেমন একটা সহজ গুরুত্ব আছে বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে তাই। এবং হঠাৎ যেন একটু প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিল! গুণ গুণ করে গান ধরে দিয়েছিল। তারপর বেশ সহজ সুরেলা গলায়।

পরিণতি সেই দিনই চরমে পেঁাচেছিল। ডায়মণ্ডহারবারে নির্দিষ্ট স্থানে আয়োজন সবই ছিল। পার্থ ছিল না। একখানা চিঠি রেখে সে কলকাতায় ফিরে গেছে ট্রেনে। লিখে গেছে—জরুরী দরকারে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তোমরা তার জন্যে বিব্রত হয়ো না। আনন্দ করো।' আশ্চর্যভাবে পরিপূর্ণ এবং সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ হল সে আনন্দ সুরেনের আত্মসমর্পণে। আজ ঘুমের মধ্যেও মন হচ্ছে—এইটের প্রত্যাশা করেই সে যেন শবরীর মত প্রতীক্ষা করে বসেছিল সুরেন আত্মসমর্পণ করবে।

হ্যাঁ। সুরেন আত্মসমর্পণ করলে। সে না। সুরেন বললে—কোন মুসলমান কবি বলেছিল—প্রেয়সীর ঠোঁটের পাশের তিলটির জন্যে আমি সমরকন্দ বোখারা দিয়ে দিতে পারি। আমি আমার সব দিতে পারি তোমার মুখের হাসির জন্যে।

প্রগল্‌ভা সুচন্দ্রা খিল খিল করে হেসে বলেছিল—নাও-নাও ধর ধর। শুধু তিল নয় তিলশুদ্ধ প্রেয়সীকে! কিন্তু বন্ধু যদি জানতে পারে?

সুরেন বলেছিল—জানুক না! তারপর হেসেছিল রহস্যময় হাসি।

শেষে জানতে পেরেছিল—পার্থ তাকে সুরেনের কাছে বিক্রি করেছে। ডাইভোর্সে সম্মতি দিয়ে পত্র দিয়েছে। এবং চিঠিও একখানা লিখেছে। তাতে লিখেছে—সুচন্দ্রাকে তোমার হাতে দিলাম আমার সব দাবি পরিত্যাগ করে। এবং তার জন্য টাকাও দিয়েছ তুমি।

সে এবার আতঙ্কিত শঙ্কিত হয়েছিল।

বিক্রি করেছে তাকে? পিছিয়ে এসেছিল সে। তার ভাবভঙ্গি

দেখে সুরেন ভয় পেয়ে তার হাত ধরে কিছু বলতে চেয়েছিল। সে সরে এসেছিল, ভয়ে পিছিয়ে এসেছিল।

সুরেন এবার মিনতি করে ডেকেছিল—সুচন্দ্রা।

সে বলেছিল—না।

—ও কিছু নয়। সুচন্দ্রা?

—আমাকে কিনেছ তুমি। আমি কেনা—বাঁদী?

—আমি ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি ওখানা। বিশ্বাস কর—পার্থকে আমি এসব লিখতে বলিনি। সে টাকা চাইলে—। তাকে তিন হাজার টাকা দিয়েছি। আরও চাইলে। এবং এই চিঠিখানা লিখে দিলে।

—ছিঁড়ো না ওখানা। আমাকে দাও। আমি তোমাকে ওর জন্যে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

আমি তোমার পায়ে ধরছি সুচন্দ্রা! বিশ্বাস কর আমিই তোমার ক্রীতদাস সুচন্দ্রা।

তার সেই গম্ভীর চেহারাখানা কেমন যেন নেলাক্ষ্যাপার মত হয়ে গিয়েছিল। সে ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসে—সত্যিই পায়ে ধরতে চেয়েছিল। এবার হেসে ফেলেছিল সুচন্দ্রা। কিন্তু তবু সে হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিয়েছিল নির্বোধের মত।

সুরেনের কাছ থেকে ভবেশের কাছে।

পার্থের মত সুরেনও ভবেশকে ডেকে এনেছিল। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভবেশ রায়, থিয়েটার জগতের মস্ত ব্যক্তি; ম্যানেজার এ্যাকটর, আমার—

ওঘরে টেলিফোন বাজতে শুরু করেছিল। সুরেন একবার বলেছিল—আঃ! তারপরই বলেছিল—ওঃ, ভারত ফিল্মসের ফোন করবার কথা। বলে কথা অসমাপ্ত রেখে ওঘরে চলে গিয়েছিল; বলে গিয়েছিল—আসছি।

ভবেশ থিয়েটারের লোক—অনেক বছর থিয়েটার কেটেছে। সে রূপসী সুচন্দ্রার দিকে তাকিয়ে ছিল—সম্ভবতঃ মনে মনে হিসেব করছিল—এ মেয়েকে রঙ মাখালে সে রঙীন মেয়ে কেমন দেখতে

হবে।

সন্ধ্যে রোজই হয়। সে মনোরমা। কিন্তু যেদিন সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা মেঘের প্রলোয় বুলোয় মুখে, সেদিন সূর্যের লাল ছটায় হোলীর দীনের রঙ্গিনী হয়ে ওঠে।

www.boiRboi.blogspot.com

সুরেন এখন ওঘরে কথা বলছে। এঘরে ভবেশের মুগ্ধদৃষ্টি সম্মুখে অস্বস্তি বোধ করছিল সুচন্দ্রা। ভেবে পাচ্ছিল না কি বলবে বা কি করবে। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে ইঙ্গিতে জানাবে—দৃষ্টিটা একটু বদলান বা ফেরান? অথব বলবে ওতে আমি চঞ্চল হইনে। অথবা সে বলেছিল—বেশ প্রগলভ ভঙ্গিতে একবার নড়ে চড়ে বসে বলেছিল—আমি কিন্তু সুরেনের বিয়ে করা বউ নই।

সবিস্ময়ে তাকাবার কথা ভবেশের নয়। সে সুরেনকে জানত। সুরেন তাকে কোন কথা না বললেও—আকস্মিকভাবে ফ্ল্যাট নিয়ে সেই ফ্ল্যাটে সুচন্দ্রাকে এনে তোলার মধ্যেই সব কথা বলা ছিল। কারণ সুরেনের স্ত্রী-পুত্র আছে, বাসা আছে। এবং হঠাৎ গাড়ী কেনার ব্যাপারটার মধ্যেও এমনি একটা গন্ধ পেয়েছিল সে। সুতরাং বিস্ময়ভরে কেন তাকাবে সে? তবু সে তাকিয়েছিল। এ মেয়ে তো সহজ মেয়ে নয়!

ভবেশের মুগ্ধদৃষ্টি সবিস্ময় হয়ে উঠল—সুচন্দ্রা আরও প্রগল্‌ভ হল—বললে—একদিন থিয়েটার দেখাবেন?

—নিশ্চয়ই। একদিন কেন, প্রতি থিয়েটারের দিনই আসুন—একটা বক্স আপনার জন্যে রিজার্ভ থাকবে।

সকৌতুকে সুচন্দ্রা বলেছিল তা মন্দ হয় না।

—এক কাজ করুন না, আরও ভাল হবে।

—কি কাজ?

স্টেজে নামুন না। আপনি যেভাবে বললেন—আমি কিন্তু সুরেনের বিয়ে-করা বউ নই;—আর আপনার যা রূপ—তাতে স্টেজে ফার্স্ট এ্যাপিয়ারেন্সেই থিয়েটার ওয়ার্ল্ড জয় করে ফেলবেন।

—সত্যি?

মৃত্যু মাথায় করে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে ভবেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটুকু ভারী মধুর মনে হচ্ছে! আশ্চর্য স্পষ্টভাবে কথাবার্তা—ঘটনার খুঁটিনাটিগুলি হয়ে রয়েছে।

কাজী সাহেবের গানটা মনে পড়ছে—'অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। আজও বাসী মনে হচ্ছে না। মনের রসনায় স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে। ভবেশের সঙ্গে খেলা করেছিল সে।

ঘাড় বেঁকিয়ে একটা কটাক্ষ হেনেই সে বলেছিল—সত্যি!

না-হলে সে জানত সে তা পারে।

ভবেশ বলেছিল আমি—আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

আরও কৌতুকের সঙ্গে সে বলেছিল—কি গ্যারাণ্টি?

—তিন বছরের কনট্রাক্ট স্টেজে; প্রথম বছর তিনশো, তারপর চারশো, থার্ড ইয়ারে পাঁচশো।

যাবে বলে লীলাভরে ঠোঁট বাঁকানো, সেইভাবে ঠোঁট বেঁকিয়ে দীর্ঘচ্ছন্দে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উঁ—হু।

উঁহু কেন?

—এই বাজারে ওটা কি মনোহর কিছু? জাত যাবে পেট ভরবে না।

—বেশ—চারশো, পাঁচশো, ছশো।

এই সময়ে ফিরে এসেছিল সুরেন। এবং প্রশ্ন করেছিল—কি? চার পাঁচ ছয়—কি?

সুচন্দ্রা দেবীকে টেজে একটা অফার দিচ্ছি।

—স্টেজে?

—হ্যাঁ। তোমার আপত্তি আছে?

—না। অন্ততঃ তোমার স্টেজে নেই।

ভবেশ চলে গেলে সুরেন বলেছিল—ভবেশের স্টেজের এখন খুব চলতি। লোকটাও ভাল। নামবে ও স্টেজে?

—না।

—কেন?

—না।

—তবে ওকে এই রকমভাবে বলছিলে যে ?

—বলছিলাম—। তামাশ করে বলছিলাম ধরো।

—তামাশা করে ?

—হ্যাঁ। উনি যেমন বললেন আমিও তেমনি বললাম। উনি বললেন স্টেজে নামুন—আমি বললাম মাইনে কত দেবেন। তামাশা-পরিহাস।

চুপ করে গিয়েছিল সুরেন।

পরের সপ্তাহে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সুরেনের সঙ্গে। থিয়েটার ভাল লাগল না খুব, কিন্তু ভবেশবাবুকে ভাল লাগল।

গ্রীনরুমে বসেছিল ভবেশবাবু। ভবেশবাবু নাট্যকার-এ্যাকটর, ভিলেনের পার্ট করছে এবং ম্যানেজার তো বটেই।

এ্যাকটর একট্রেসরা দুর্দান্ত ভয় করে, তেমনি সম্ভ্রমও করে। এ্যাকটর হিসেবে ভাল এ্যাকটর ভবেশবাবু। তা হোক—এসব সত্ত্বেও নাটকখানার ব্যর্থতার জন্য জলুস ছিল না। সেই জলুসটা এল এর পরের বছর। ভবেশবাবুর নতুন বই খোলা হল। ভবেশবাবু নাট্যকার, সুরেন সেট-সিন তৈরী করলে, পোশাক করালে। রিহারস্যাল থেকে ওপেনিংয়ের দিন পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় এবং শেষ পাঁচ-ছ দিন সকাল-সন্ধ্যেই কাটিয়ে এল থিয়েটারে। অডিটোরিয়ামে প্রথম সারিতে বসে রিহারস্যাল দেখেছে। তার পাশে কখনও বসত সুরেন, কখনও ভবেশবাবু। কখনও ওরা দুজনে। কখনও এসে বসত ওই আশা। আশার ভাল লেগেছিল সুচন্দ্রাকে। বড় এ্যাকট্রেস দুজনের গুমোর ছিল খুব, কিন্তু তারাও এসে কথাবার্তা বলত মধ্যে মধ্যে। নতুন এ্যাকট্রেস এনেছে ভবেশবাবু হিরোইনের পার্টের জন্যে। মেয়েটা দেখতে কালো, কিন্তু অভিনয়ের পর মনে হল সে আশ্চর্য সুন্দরী।

প্রথম দিনই বই হৈ হৈ করে জমে গেল। আশ্চর্য পার্ট করলে ভবেশবাবু। হিরোইন আরতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে দর্শকেরা ফিরে গেল। অভিনয়ের পর সুরেনের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে ভবেশবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে এল।

ভবেশ বললে—কেমন লাগল ?

—চমৎকার !

—বাস্ !

—আর কি বলব ? অ-পূ-র্ব বললে যদি খুশী হন—তাই বলছি।

ভবেশ বলছে—না—না। তা না-লাগলে তা বলবেন কেন ?

সুরেন বললে—আমি বলছি যে, ভবেশ এইটেই তোমার শ্রেষ্ঠ নাটক। এবং এ নাটক চলবে।

ভবেশ বললে—তোমার সেট কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর হয়েছে। মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করছি আমি। শোন, তোমার টাকাটা নিয়ে যেয়ো তুমি।

—কবে ?

—যেদিন হোক প্লে-র দিন। তুমি যা চেয়েছিলে তাই দেব।

অনেক টাকা পেয়েছিল সুরেন। কত তা সে বলেনি—তবে অনেক। লাইটিংও তারই ছিল।

আসবার সময় ভবেশ হঠাৎ যেন বলে ফেলেছিল—এই হিরোইনের জন্যেই আমি বলে নিলাম।

সে বলেছিল—নাঃ।

এ 'না'-এর অর্থ কি তা সে-ও ভেবে পায়নি। বইটা কিন্তু সত্যিই ভালো হয়েছিল। তা বলতে সুচন্দ্রার ইচ্ছে হয়নি। ভবেশ ম্যানেজার মানুষটি যেন অকস্মাৎ একদিনে খাতিরের লোক হয়ে উঠেছিল—সুরেন যেন তোষামোদ করছিল—সেটা সুচন্দ্রার ভালো লাগেনি। ভবেশের কথায় অর্থহীনভাবে 'না' বলে সে খুশী হয়েছিল।

ওই নিয়েই ঝগড়া সুরেনের সঙ্গে।

ঝগড়া অবশ্য আগে-আগেও হয়েছে। না-হওয়া হয়নি। কিন্তু সে ঝগড়া ঝগড়া নয়! এই ঝগড়াটা অকস্মাৎ গর্ত থেকে লুকানো সাপের মত বের হয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল। ওই নতুন নাটক উদ্‌বোধনের মাস দুয়েক পর।

ঢং। ঘণ্টা বাজছে। গুমটিতে ওয়ার্ডার ঘণ্টা বাজিয়ে জানাচ্ছে। ক'টা বাজল। ঢং, একটা—।

তারপর ? ঘণ্টার শব্দে তন্দ্রার মধ্যেও থেমে গেছে পিছনের কথা স্মরণ করার ধারাবাহিকতা। অপেক্ষা করে রয়েছে—আবার বাজবে ঘণ্টা—আবার।

একটা একটা করে এক দুই তিন চার—। কিন্তু এক—গণনা করে প্রতীক্ষা করে রয়েছে সুচন্দ্রা। একের পর দুই তো বাজল না ? তাহলে ?

এক। শুধু এক। তাহলে একটা বাজল ? এগারোটা বারোটা কখন যে বেজে গেছে সুচন্দ্রা জানতে পারেনি। তার কানে আসেনি ! সে শুনতে পায়নি।

তাহলে—সে কি কিছুক্ষণ সত্যি ক'রে ঘুমিয়েছিল ?

হ্যাঁ। বাইরেটা ঘুমিয়েছিল, ভিতরটা ঘুমোয়নি। অন্তরাত্মা জেগেছিল—পিছনের কথাগুলো অন্তরাত্মার চোখের সামনে দিয়ে ভেসেই চলেছিল।

একটা বাজল। আর কতক্ষণ সময় ?

দুই তিন চার পাঁচ। চার ঘণ্টা। এবার উঠে বসল সুচন্দ্রা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সব যেন অসাড় হয়ে গেছে। কান্না আসছে না—দুঃখ হচ্ছে না—শুধু একটা উদ্‌বেগ। সমস্ত বুকটা যেন উদ্‌বেগে ভরে উঠেছে।

জেলখানার আলসের কোন ফেকরে প্যাঁচা ডাকছে।

* * *

মনটা অসাড় হয়ে গেছে এও বটে, আবার যা-হয়ে-গেছে-করে-ফেলেছে, তার জন্যে বুক-ফাটানো আক্ষেপও নেই—এও বটে। 'করে-ফেলেছে-হয়ে-গেছে' সে কি করবে। বাঁচবার জন্যে আসছে না ! দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল। ওই বড় জোর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। কপালে তার এই ছিল, সুতরাং সে কি করবে ? বাঁচাবার জন্যে তো কম চেষ্টা করেনি ভবেশ। বড় ব্যারিস্টার দিয়েছে—থিয়েটারের এ্যাকটর-এ্যাকট্রেস সাক্ষীদের নরমভাবে সাক্ষী দেবার জন্যে বলেছে। দিয়েছেও। অন্ততঃ একথা এক আশা ছাড়া সকলকেই বলিয়েছে যে 'সুচন্দ্রা এমন কাজ করতে পারে এ-কথা আমরা ভাবতেও পারিনে।'

সুচন্দ্রার ধর্মপ্রাণতার কথাও বলিয়েছে তাদের দিয়ে। কথা শোনেনি শুধু আশা। সে পানের ছিবড়ে প্রসাদ প্রসঙ্গটা বলেছিল আদালতে। ভবেশ তার ব্যারিস্টারকে দিয়ে জেরাতে প্রশ্ন করিয়েছিল 'ভবেশ ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল—ভবেশ ম্যানেজারের মাথা ধরলে তুমি মাথা টিপে দিতে! এবং সুচন্দ্রা দেবী থিয়েটারের চাকরি নেওয়ার পর ভবেশবাবু আর তোমাকে ডাকতেন না। নয় কি? আরও প্রশ্ন করিয়েছিল—'ভবেশবাবুর 'জোয়ার-ভাটা' নাটকের প্রথম মাসে—পর পর পাঁচ সপ্তাহেই সুচন্দ্রা দেবী নাটক দেখতে এসেছিলেন—নয় কি?'

আশা বলেছিল—হ্যাঁ। পর পর পাঁচ সপ্তাহের প্রায় সব ক'দিনই এসেছিল সুচন্দ্রা।

—সব ক'দিন বলতে কি বলছ?

—সপ্তাহে তিন দিন প্লে হয়। শনি রবি বৃহস্পতি। তিন দিনে চারটে শো। রবিবারে দুটো শো হয়। তা সুচন্দ্রা পাঁচ সপ্তাহে কুড়িটা শো-র মধ্যে তা দশটা শোতে এসেছিল।

—তুমি এই নিয়ে গুজব রটিয়েছিলে সে সুচন্দ্রা ভবেশবাবুকে পাকড়াতে আসছে?

—হ্যাঁ বলেছি এবং তা সত্যি। সুচন্দ্রা একলা আসত থিয়েটার দেখতে, ওর বাবু মানে সুরেনবাবু, আমাদের 'জোয়ার-ভাটা'র সেট তৈরী করেছিলেন—আমাদের বাঁধা আর্টিস্টও বটে এক রকম। উনি 'জোয়ার-ভাটা' খোলার পরই ফিল্মের কাজে মাদ্রাজ চলে যান। সুচন্দ্রা তখন থিয়েটার দেখতে আসার অছিলা করে আসত বক্সে বসে থিয়েটার দেখত, ড্রপ পড়লেই চলে আসত গ্রীনরুমে; ভবেশবাবু ম্যানেজারের ঘরে বসে গল্প করত—হাসত—চা খেতো। আমি ম্যানেজারবাবুর ঘরে যেতাম্। আমিই চা-টা দিতাম ওঁকে। থাকতাম দাঁড়িয়ে। কথাবার্তা শুনেছি। গুজব আমি রটাইনি। সত্যি যা তাই বলেছি। ও তো আমরা বুঝি। ওতে আমাদের ভুল হয় না।

ব্যারিষ্টার বলেছিল—তা হয়তো হয় না। হয়তো কেন, নিশ্চয়

হয় না। কিন্তু ভালোবাসার মানুষকে কেড়ে নিলে বুক ফেটে যায় আর যে কেড়ে নেয় তার ওপর যে আক্রোশের আর শেষ থাকে না—এও তো সত্যি—?

কোর্টে চাপা হাসির সাড়া উঠেছিল।

আশা রেগে উঠে বলেছিল—তাও সত্যি বটে। কিন্তু এই মেয়েটার স্বভাব ওই।—

* * *

সুরেনও তাকে ওই বলে গাল দিয়েছিল, অপমান করেছিল। সে তাকে চড় মেরেছিল। আশার কথা সত্যি। আশা মিথ্যে বলেনি।

হ্যাঁ—তার স্বভাবটা যেন তাই বটে। 'জোয়ার ভাটা'র ওপেনিংয়ের দিন সে একটা অর্থহীন না' কথা বলে এসেছিল ভবেশবাবুকে।

অর্থহীনও বটে, আর ওর অর্থ অনেক এবং গভীর তাও বটে।

ভবেশ ম্যানেজার পরে তাকে বলেছে—সে যে কি 'না' সে আমিই জানি।

ওরে বাপ রে, থিয়েটার নাটক আমি যে আমি ভবেশ চাটুজ্জে—সব 'না' হয়ে গেলাম।

সুরেনও তাকে ওই 'না' কথা নিয়েই চার্জ করেছিল।

সুরেন চলে গেল মাদ্রাজ—'জোয়ার-ভাটা' খোলার ঠিক পরই। সুচন্দ্রা তখন ফ্ল্যাটে একা। একটা ঝি আছে; সে-ই সব করে। বাজার হাট-ঘাট রান্না-বান্না—সব। সুচন্দ্রা শুধু জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে; নিচের রাস্তায় মানুষগুলো চলে অসীম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তাদের দেখে; আর নিজের কাপড় কেচে পরিষ্কার করে, ইস্ত্রি করে। নিজেকে সুখী বলে ভাবতে চেষ্টা করে। অসুখের তো কারণ ছিল না। নিজেকে সুখী সে ভাবতে পারত। সে অধিকার তার ছিল।

পার্থ যেদিন তার কাছে হার মেনে তাকে মহারাণী সম্বোধন করে তার মালাকার হতে চেয়েছিল—সেদিনের চেয়ে শতগুণে বেশি সুখ তখন তার। সুরেন তার জন্যে গাড়ী কিনেছে—ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে—এবং তার স্ত্রী সন্তান এদের ছেড়ে তার কাছে একান্ত অনুগতের মত—।

মনে পড়ে ডায়মণ্ড হারবারে সুরেন তার পায়ে ধরতে চেয়েছিল। এই ফ্ল্যাটে ? প্রথম দিন তার খাটে বসিয়ে—তার পায়ের তলায় বসে —ধরা-ধরা গলায় গান গাইতে শুরু করেছিল। ভাবলে হাসি পায়। সেই মুহূর্তটি কিন্তু হাসি পায় না। এই অর্থহীন হাস্যকর বোকামিই মনে হয় জীবনের পরম রমণীয় কাব্য। দেহ থর-থর করে কাঁপে, চুলের খোঁপা খুলে এলিয়ে পড়তে চায়। গলায় মালা পরে দোলাতে ইচ্ছে করে।

জানালা থেকে চোখে পড়েছিল থিয়েটারের পোষ্টার। ভবেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'জোয়ার ভাটা'। যুগের শ্রেষ্ঠ নায়ক। শ্রেষ্ঠাংশে—। ভবেশ এবং নবাগতা নায়িকা পূর্ণিমা দেবী।

কি মনে হয়েছিল—হঠাৎ কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেজে-গুজে বেরিয়ে পড়েছিল এবং সোজা গিয়ে উঠেছিল থিয়েটারে। রিহারস্যালে সুরেনের সঙ্গে এসে মোটামুটি পরিচয় তখন হয়ে গেছে গেটকীপারদের সঙ্গে ; তারা দোর ছেড়ে দিয়েছিল—এবং সে গিয়ে উঠেছিল গ্রীনরুমে ভবেশবাবুর ঘরে।

—নমস্কার।

—আপনি! আসুন-আসুন-আসুন।

সে প্রগল্‌ভা চিরকাল। বলেছিল—তিনবার আসুন! এসেছি, যখন বলবার প্রয়োজনই ছিল না—তখন তিন বা—র আসুন!

হাজারবার বলছি। আসুন—আসুন—আসুন—আসুন—আসুন।

সে বলেছিল—থামুন—থামুন—থামুন—থামুন।

বেশ একদফা সরব হাসির মুখর প্রসন্নতায় গোটা ঘরখানাই হৃদ্যতায় ভরে উঠেছিল। ঠিক যেন দুপুরবেলা ঘুমের পর দমকা হাওয়ায় জানালা খুলে গিয়ে এক ঝলক আলোয় ঘর ভরে দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া।

—বসুন কি ব্যাপার ? কোন—মানে—অসুবিধা হয়েছে নাকি—সুরেন নেই ?

—সেইটেই অসুবিধে। একলা পড়ে গেছি। ভাবলাম থিয়েটার দেখে আসি।

খুব ভাল। যখন মনে হবে এমনি একলা একলা তখনই চলে আসবেন। থিয়েটার না থাকলে আমাকে খবর দেবেন—আমি যাব—চা খেয়ে গল্প করে চলে আসব।

হয়ে গেল শুরু। এবং শুরু থেকেই ভাল লাগল। অসাধারণ ভাল লাগল।

এক মাসের মাথায় বিচিত্রভাবে ঘটনা যেন পাক খেয়ে খেয়ে একটা আবর্ত সৃষ্টি করে তুললে। থিয়েটারে প্রোপাইটারদের সঙ্গে ভবেশ-বাবুর ঝগড়া হয়ে গেল একটা সামান্য কারণে।

বইয়ের হিরোইনের পার্টের এ্যাকট্রেস পূর্ণিমাকে বকেছিল ভবেশ-বাবু। পূর্ণিমা তার কথা না মেনে নিজের ইচ্ছামত অভিনয় করেছিল।

নায়িকা দরিদ্র-কন্যা। সে দারিদ্র অপরিসীম। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের কথা আছে। সেই বেশে সে প্রথম বের হবে কিন্তু তার মধ্যেই তার অপরূপ-রূপ আকর্ষণ করবে নায়ককে। ভবেশবাবু তার ব্যবস্থা করেছিল—কাপড়টাই কালো রঙের কাপড়। জামাও তাই। হঠাৎ সেদিন পূর্ণিমা কাপড়খানাকে পিঠের দিকে এবং সামনে বুকের কাছে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছিল অধিকতর বাস্তব করবার জন্যে। ড্রেসার বারণ করেছিল—ভবেশবাবুর নাম করেই বারণ করেছিল—কিন্তু সে কথা সে শোনেনি। ষ্টেজে ওই পোশাকেই বেরিয়েছিল পূর্ণিমা। বুকের কাছটায় ছেঁড়াটার জন্যে গ্যালারী থেকে সিটি বেজে উঠেছিল।

ঘটনাটা কানে যেতেই ভবেশবাবু পূর্ণিমাকে ডেকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—এসব রিয়ালিজিম কে শেখালে? এ্যাঁ?

পূর্ণিমা চটে গিয়ে জবাব দিয়েছিল শিখিয়েছে বই কি কেউ। এবং সে মুখ্যু নয়।

—হ্যাঁ, মহাপণ্ডিত। তা বুঝতে পারনি। কিন্তু এসব চলবে না এখানে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

এই নিয়ে মালিক এসে দাঁড়ালেন। না-না। ওটা বেশ হয়েছে। ওটা পূর্ণিমা যা করেছে তাই ভাল।

ভবেশবাবু বললে—তাহলে সত্যি ক'রে ভিখারিণীর ময়লা ছেঁড়া

কাপড় পরতে হবে— কালো থান কাটা পিসের কাপড় পরে কাঁইচি-চালিয়ে কেটে নিলে হবে না। এবং এভাবে ডিরেকশনে হাত দিলে আমি সহ্য করব না।

তিলে তাল হয়ে উঠল।

ভবেশবাবু রেজিগনেশন দিল। রাতারাতি নতুন এ্যাকটরের ব্যবস্থা করলে প্রোপাইটার। ভবেশবাবুর সঙ্গে আশা—তার সঙ্গে আরও ক'জন ভবেশবাবু অন্য একটা স্টেজ ভাড়া নিয়ে ওই 'জোয়ার ভাটা' নিয়ে নামবার সংকল্প ক'রে মাদ্রাজে সুরেনকে টেলিগ্রাম করলে। সুরেন এল।

প্রাণপণ খেটে সেট তৈরি করতে লাগল। তার সঙ্গে প্রায় নেশায় মেতে ওঠা মানুষের মত অকাজে বা কাজে ভবেশবাবুর আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। ভবেশবাবু এরই মধ্যে বললে—আপনি নামবেন হিরোইনের পার্টে? আমি তাহলে ওদের দেখিয়ে দিই।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল সুচন্দ্রার মুখে—আমি?

—হ্যাঁ।

—পারব?

—পারিয়ে নেব। এমন পারিয়ে নেব যে গোটা কলকাতাকে নাড়া দিয়ে দেব।

—কি দেবেন আমাকে?

—মাইনে পাঁচশো টাকা—এবং—

—এবং—

—এবং আপনার কেনা হয়ে থাকব।

হেসে ফেলেছিল সে। একেবারে কেনা?

—হ্যাঁ।

—ক'দিনের জন্যে?

—আজীবন—

—তা হলে রাজী।

—দেখুন।

—হ্যাঁ, রাজী! রাজী! রাজী।

হৈ হৈ করে ভবেশ ম্যানেজার বেরিয়ে গিয়ে তখনই-তখনই এই মোটা হরফে বড় কাগজে বিজ্ঞাপন ছেপে কলকাতা ছেয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল—নায়িকার—ভূমিকায় সুচন্দ্রা দেবী। নাট্যজগতে নবাগতা অভিজাত কুলজাতা নবীনা রহস্যময়ী। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নবচন্দ্রোদয়।

www.boiRboi.blogspot.com

ঘটনাটা সেই দিনই ঘটে গেল।

ভবেশবাবু যখন সুচন্দ্রাকে দিয়ে সই করাচ্ছে তখন আশা সুরেনের কাছে বসে কথা বলছিল। সুরেন হাতের তুলি ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল। বাড়ি ফিরেই সুরেন বলেছিল—একবার জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেও হল না? কনট্রাক্ট সই করে দিলে? আমি তো ওখানেই ছিলাম।

সুচন্দ্রার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সে বলেছিল—কেন? তুমি তো ও থিয়েটারে বই খুলবার সময় উনি যখন বলেছিলেন নামতে আমি না বলেছিলাম—তুমি বলেছিলে—সই করলে না কেন? বলনি?

তখন তুমি যে এমনিভাবে এই করতে পার তা ভাবতেই পারিনি আমি।

—কি? এমনিভাবে এই করতে পারি—? কি করতে পারি?—ঢলাঢলি।

—ঢলাঢলি? মানে?

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে সুরেন তার কাছে তার মুখ এগিয়ে এনে বলেছিল—মানে ঢলাঢলি। ভবেশ ম্যানেজারের সঙ্গে খানকীপনা—শুনছি তো আমি মাদ্রাজ রওনার দিন থেকেই চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল তার গালে।

সুরেন বাঁ হাতে তার ডান হাত চেপে ধরে ডান হাতে স্যাণ্ডেল ধরে তাকে মারতে আরম্ভ করেছিল। এবং বলতে আরম্ভ করেছিল—কসবী—খানকী—কুত্তি—!

এমনটা সে ভাবতে পারেনি। এমন যে হতে পারে তার ধারণায় ছিল না। এমনিভাবে তাকে পায়ে-পায়ে দলিত পিষ্ট করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে সুরেন! কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারত না। পারে না কেউই, কিন্তু তার কথা বেশি স্বতন্ত্র। কখনও পারত না।

সে সুযোগ খুঁজছিল একটা সাংঘাতিক কিছু আঘাত করবার জন্য। এরই মধ্যে এসেছিল ভবেশ ম্যানেজার।

সুরেন মুহূর্তের জন্য থমকে ছিল—তারপর আবার তুলেছিল তার স্যাণ্ডেল। কিন্তু ভবেশ এসে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল—মহিষাসুরের সম্মুখে দেবীর বাহন সিংহের মত।

ভবেশকে সুরেন বলেছিল—সে তাকে কিনেছে। পার্থ মুখুজ্জে, সেই পঙ্গু অক্ষম সঙ্গীত-বিলাসীর কাছ থেকে তাকে কিনেছে। পার্থের সেই চিঠিখানা সে বের করে দেখিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার গহনাগুলো খুলে ফেলে দিয়েছিল। সুরেন কুৎসিৎ কদর্য ব্যঙ্গে হেসে বলেছিল—ওগুলো তারই দেওয়া। সে নগদ চার হাজার টাকা দিয়েছিল পার্থকে।

ভবেশ টাকার জন্যে চেক দিয়ে বলেছিল—এই নাও।

সুরেন বলেছিল—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। ওকে নিতে পার তুমি। তোমার স্টেজ থেকে আমি কাজ পাব। সে পার্থের চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরেছিল ভবেশের দিকে। সুচন্দ্রা তখন নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছে। সে বলেছিল—ও চিঠি নয়! চিঠিতে মানুষ বিক্রি হয়। সুচন্দ্রা তো হয়ই না। সুচন্দ্রা তার জন্যে যে হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিয়েছে—সেইটে ফেরত দাও।

সেটা ফেরতের পর খুলে দেওয়া গহনাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—এগুলো আমার। তুমি দিয়েছিলে—কিন্তু আমার হয়ে গেছে। পেট ভাতাতে ঝি মেলে না সুরেন। শুধু খাওয়া-দাওয়া অবশ্য ভদ্র রকমের একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে সুচন্দ্রাকে পাওয়া যায় না এটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই সুরেন। অথবা এগুলো আমাকে তুমিই কুড়িয়ে দাও।

তারপর ভবেশকে বলেছিল—চলুন ভবেশবাবু একখানা ঘর আমাকে দিতে পারবেন তো?

সুরেন বলেছিল—এটাই তুমি রাখ। তুমি থাক যেমন ছিলে। আমি আর ফ্ল্যাট নিয়ে কি করব? আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

যাবার সময় ছোট স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে সুরেন বলেছিল—এটা তুমি ভুলে যেতে পার না ?

সে বলেছিল—না। দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি।

—ভবেশের যদি আপত্তি না থাকে ?

—ভবেশবাবুর আপত্তি ? হেসে ফেলে বলেছিল—ও করো না। শেষে দু'জনে সুন্দ-উপসুন্দ হবে ? তার থেকে বাড়ি যাও। আর ভবেশবাবু টাকা দিলেও আমাকে উনি কিনেছেন একথা নিশ্চয় ভাবছেন না। কি ভবেশবাবু তাই ভাববেন নাকি।

হেসে ভবেশ বলেছিল—নিশ্চয় না। তোমাকে কেনা যায় না সুচন্দ্রা। তুমিই কিনে ফেল সকলকে। বিনামূল্যে কিনে নাও।

—ঠাট্টা নয় ভবেশবাবু, যে টাকা দিলেন আপনি, সে টাকা একবারে দেবার সাধ্যি আমার নেই। তবে ফেলেও রাখতে চাই না—শেষে আবার আপনিও সুরেন হয়ে উঠবেন।

সুরেন আর দাঁড়ায়নি—সে স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। সে কিংবা ভবেশ ঘটনাকে গ্রাহ্যই করেনি। ঘরে খোলা জানালা দিয়ে চড়ুইপাখী একটা অনবরতই যাচ্ছিল আসছিল—এও ঠিক তেমনি একটা কিছু।

ভবেশ তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সেইভাবে তাকিয়ে থেকেই বলেছিল—সুরেনটা মূর্খ। তোমাকে কেনা যায়, ভেবেছিল।

—কেনা যায় না—জেতা যায় !

—উঁহু। তাও যায় না।

সে হেসে বলেছিল—একখানা গান শোনাই শোন। সুচন্দ্রাই প্রথম ভবেশকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিল। একেবারে অত্যন্ত সহজ পরিণতির ভঙ্গিতে। এবং তার জন্যে কোন সংকোচ কি লজ্জা প্রকাশ করেনি। ন্যাকামি করেও করেনি।

শোনাও।

সুচন্দ্রা অনেক দিন পর অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছিল—'কি আর

বলিব বল।' বড় মধুর আত্মসমর্পণের গান। তুমি সুখে রাখলে সুখে থাকব। দুঃখে রাখলে তাই থাকব। তুমি কাঁদলে কাঁদব—তুমি হাসলে হাসব—।

গান শেষ করে বলেছিল—কেমন লাগল বল?

ভবেশ বলেছিল—তোমার পার্টে খান দুই গান দিয়ে দিই। কি বল। পূর্ণিমা ভাল গান গাইতে পারে না বলে গান দিইনি। তুমি গান গাইলে স্টেজ মাৎ হয়ে যাবে—।

সে বলেছিল—দাও।

* * *

সে কথা সত্য হয়েছিল। ভবেশবাবুর নতুন স্টেজে নাটক একেবারে আগুন হয়ে জমে উঠেছিল। বিশেষ করে হিরোইন ওই নবাগতা সুচন্দ্রার অভিনয়, গান এবং তার রূপ—নাট্যরসিক সমাজকে কিছুদিন যেন আফিংয়ের ক্ষেতে ফুল ধরার সময়ের মৌমাছির মত নেশা ধরিয়া মাতিয়ে তুলেছিল। ফলে পুরনো স্টেজে 'জোয়ার-ভাটা'র মত হিট হওয়া বই ও ফ্লপে পরিণত হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মামলা-মকদ্দমাও কম হয়নি। ও স্টেজের প্রোপ্রাইটার—এ নাটক তার কেনা বলে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে কিছু হয়নি। ভবেশ ম্যানেজার থিয়েটার জগতে এবং ওখানকার আনই-কানুনে পাকা লোক; ও পক্ষের সব বাধা ব্যর্থ করে দিয়ে সে তার নতুন থিয়েটারে জোয়ার-ভাটা'কে আশ্চর্য সাফল্যে সফল করে তুলেছিল। যাকে থিয়েটারি ভাষায় বলে রম্‌রম্‌ ক'রে চলা তাই চলেছিল। সব থেকে নাম হয়েছিল সুচন্দ্রার এবং সে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের কৃতিত্ব নিশ্চয় নিল কিন্তু সব থেকে বেশি প্রশংসা পেয়েছিল তার গান। এই গানের জন্যেই কোন এক দর্শক কবি অনামিপত্রে তাকে বন্দনা করে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিল।

—'তুমি বিহঙ্গিনী।'

ঢং ঢং। দুটো। বুকটা ধরাস করে উঠল। না—আর বাজল না। বাজবে কি—সে তো একটার পর থেকে জেগে রয়েছে। দু'চোখ

মেলে জেগে বসে রয়েছে।

আর তিন ঘণ্টা। কয়েক মিনিট কম বেশি।

বুকখানা ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে ধড়াস করে আকস্মিকভাবে লাফিয়ে উঠেছিল। বুকটা সে সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেছিল। ওঃ, এখনও ধড়-ধড় করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ওঃ!

উপরের জানালাটা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকালে সে। আকাশ অন্ধকার। চাঁদ নেই। নক্ষত্রগুলি মিট-মিট করছে। এখনও ম্লান হয়নি। এখনও আকাশ গাঢ় নীল—প্রায় কালো হয়ে আসে। এ কালো আকাশ খানিকটা ফিকে হয়ে আসবে তখন। নাঃ—আকাশে আলোর স্পর্শ লাগবে না। সে আর দেখতে পাবে না সেটা। আকাশে আলোর বান ছোটা আর দেখা হবে না। গান মনে পড়ে গেল।

নীল আকাশে আলোর ইশারায়
বিহঙ্গিনী ডানা মেলে ভেসে যায় যায়
দিগন্তের অন্ত সীমানায়।
আলোর ইশারায়।
বিহঙ্গের ওই ব্যাকুল গানের সুরের ছোঁয়া লেগে
সারা আকাশ ক্ষণে-ক্ষণে শিউরে ওঠে জেগে—
বিহঙ্গ সে ডাকে প্রিয়া, আয়-আয়-আয়।
ওগো আয় আয় আয়।

তার প্রথম আবির্ভাবের দৃশ্যেই এই গান ছিল। এবং এই গানের জন্যেই ওই কবিতা এসেছিল। ভবেশ ম্যানেজার বিষয়ী লোক। সে সব জিনিসের দাম জানে। এই কবিতাটিকে সে উপেক্ষা করেনি। বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছিল। একদিন অভিনয়ের প্রথম অঙ্কে দর্শকদের সম্মুখে কবিতাটি পড়ে তার নাম বদল করে তাকে বিহঙ্গিনী নাম দিয়েছিল।

বিভা থেকে সুচন্দ্রা—থেকে বিহঙ্গিনী।

কত ফুলের তোড়া, কত চিঠি, কত মিনতি। কত সে অশ্লীল কদর্য

কথা। কত! থিয়েটারের লোকেরা অভিনয় ভালো করে, ভালো মানুষ যখন সাজে তখন সাক্ষাৎ স্বর্গের রূপ-রস-স্পর্শ এনে দিতে পারে। কিন্তু লোক তারা সবাই তো ভালো নয়!

কত কথা তার সম্পর্ক না কয়েছে! ভালো কথা নয়। না, তা সে নয়। তারা তা বলুক। সে তা নয়। 'সংসারে মাটিতে পাথর আছে, কাচ ভাঙা আছে হয়তো লোহার পেরেকও আছে—অনেক বিষ আছে, নিশ্চয় আছে—তবু মাটির থেকে নরম কিছু নেই, মাটির থেকে মিষ্টি কিছু নেই, মাটির চেয়ে মনোরম কিছু নেই। সংসারে ঘটনাকে কুৎসিৎ করে তোলে চোখ আর মন।'

ওঃ! বিহঙ্গিনীর পার্ট এখনও মুখস্থ আছে।

কতজন এল। কত—দু'হাত ভরা কত জিনিস নিয়ে। গয়না, টাকা। ওঃ, সে এক খেলা।

মনে পড়ছে—ভবেশ একদিন গ্রীনরুমে তার ঘরে এসে বলেছিল—বাঘ এসেছে।

—বাঘ! বিস্ময়ের সীমা ছিল না তার।

এক অবাঙালী ব্যবসাদারের নাম করেছিল—তার ছেলে। ছেলের সুকণ্ঠী দুই-ই।

শুনে সে খুশী হয়ে সোজা হয়ে বসে বলেছিল—বল কি?

—হ্যাঁ, এই যে দেখ না!

বলতে বলতে একটা চাকর ফুলের তোড়া এনে দিয়ে গিয়েছিল। —আপনার। বক্সে ছিলেন, দিয়ে চলে গেলেন।

—সাবধান। বাড়ীতে আসবে।

তা এসেছিল—কিন্তু সাবধান সে হয়নি, উল্টে বরং সমারোহ করেই সংবর্ধনা করেছিল। ধনীর ছেলেকে নিয়ে খেলা করেছিল কিছুদিন। তারপর একদা সে লোকটি ডুব মেরেছিল এবং অন্য নারীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল—তবে বলেছিল—ডেঞ্জারাস উয়োম্যান।

শুনে সে খিল খিল করে হেসেছিল সেদিন সারাদিন।

ভবেশের জন্যে না, ভবেশের জন্যে ঠিক নয়—থিয়েটারের জন্যে কি সে অর্থশালী লোকেদের কাছ থেকে এইভাবে খেলা-খেলে কম টাকা বের করেছে!

www.boiRboi.blogspot.com

দুখানা বই পর পর চলে—দুখানা বই ফ্লপ। ডাহা লোকসান। বাজারে টাকা আর মিলবে না। কারণ মরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে ঘোড়দৌড়ের বাজীতে ছোটানো অসম্ভব। শুধু বিহঙ্গিনীর জোরে কি বই চলে। ভবেশ তো বুড়ো হয়েছে, বেতো ঘোড়া। আর আশা! সে-ও বুড়ী! বই ভবেশের। ও চলবে না।

ভবেশ চিন্তিত হয়ে বলেছে—শেষে তুলে দেব?

সে বলেছে—টাকা মিলবে না বলছ?

—তাই তো দেখছি! শক্ত মুঠো ধরে বসেছে বুড়ো। বুড়ো মহাজন। এই ব্যবসা। চোটায় টাকা ধারের কারবার করে। জিনিস বাঁধা রেখে কারবার। মেয়াদ অন্তে বন্ধকী জিনিস তার হয়ে যায়, ওর আর এদিক-ওদিক নেই। ও নিয়ে নালিশ-মকদ্দমা চলে না। কোন প্রমাণই থাকে না। এই কড়াকড়ির মধ্যে থিয়েটারে টাকা দিত। সপ্তাহে সপ্তাহে থিয়েটার দেখতে আসত এবং টাকা নিয়ে যেত। শেষ বইটার টাকা বারো আনা ওঠেনি। বই চলল না, বন্ধ হল। এদিকের স্টাফের মাইনে বাকী।

ভবেশ নতুন বই লিখেছে—সেণ্টিমেণ্ট প্রধান বই। নায়িকা তরুণী, সুন্দরী, প্রেমের জন্য মা-বাপ-সংসার ছেড়ে প্রিয়তমের হাত ধরে পথে বেরিয়েছে। পথ চলেছে হাসিমুখে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করে। অনেকটা 'উদয়ের পথে'র মত—কিন্তু 'উদয়ের পথে'র যেখানে শেষ সেখানেই এর আরম্ভ এবং আরও পরে ধনীর চক্রান্তে নায়ক গেছে জেলে। নায়িকা সন্তান কোলে পথে পথেই চলছে। এর মধ্যে সন্তান তার মারা গেল। মেয়েটি পাগল হয়ে পথে পথে তার সন্তানের জন্য জমা-হওয়া তার বুকের স্তনভাণ্ড চেপে ধরে চীৎকার করে ডেকে বেড়াচ্ছে—খোকন—খোকন—খোকন—রে! পরিশেষে অবশ্য

প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হয়েছে। সেই বইয়ের জন্য টাকা চাই। কিন্তু বুড়ো মহাজন আর টাকা দেবে না।

বিহঙ্গিনী বলেছিল—আমায় নিয়ে আর একবার চল না। দেখি কি বলে।

হেসে ভবেশ বলেছিল—তুমি যাবে?

—তোমার অপত্তি আছে?

—আমার আপত্তি কেন হবে?

—হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হয়।

—আমি সুরেন নই।

—হ্যাঁ, তুমি ভবেশ।

আমি নাট্যকার—।

—খাঁটি। তাতে সন্দেহ নেই।

—তাহলে কবে যাবে বলো বুড়োর কাছে?

—এখনি চলো না।

—এই অসময়ে—বিকেল বেলা—

—হোক না। দাঁড়াও আমি আসছি।

মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে এসেছিল একটু সেজে-গুজে। ভবেশ দেখে যেন চমকে উঠে বলেছিল—করেছ কি?

—কি?

—এ যে বড্ড বিলাস হয়ে গেল।

হেসে বলেছিল—রণসাজ যে।

—চল। দেখি তোমার রণকৌশল।

সে কৌশল সে দেখিয়েছিল। মৃদুস্বরে সংকোচের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে—মুখ নামিয়ে কথা বলছিল। প্রৌঢ় রূঢ় কণ্ঠস্বরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আরে, তুমি কাঁদছ নাকি?—

সে বলেছিল, নতমুখে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না।

বৃদ্ধ বলেছিলেন—কাঁদছ—আবার বল, না। মুখ তোল তো!

তোল—।

মুখ সে তুলেছিল। চোখে তার জল ছিল।

বৃদ্ধ এবার বলেছিলেন—আমি ঠিক ধরেছি।

সে আবার মুখ নামিয়েছিল—এবং ভবেশ বসেছিল তার পাশেই—একটা আঙ্গুল তার গায়ে ঠেকিয়ে একটা টিপুনিও দিয়েছিল।

সে অনেক কথা। অনেক খেলা—অনেক কৌতুক—অনেক হাসি—অনেক গান। এর মধ্যে কদর্যতা খুঁজলে আছে, অন্যায় আছে, অধর্ম আছে, অশ্লীলতা খুঁজলে তাও পাবে। পেতে পার। কিন্তু পেলেও তা সত্য নয়। না—নয়।

ওঃ, সে এক যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছিল সে। যাবার সময় সে ভবেশকে রঙ্গ করে বলেছিল—রণসাজ। তা মিথ্যে বলেনি।

ভবেশ সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাকে নিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বর। যাবার আগে সে পোশাক বদল করে একেবারে পূজারিণী সেজেছিল, লালপাড় গরদের শাড়ি-ব্লাউজ পরে কপালে গোল একটা টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে। বার তিনেক হাত ধুয়েছিল। মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিয়েছিল। মনে কোন খুঁতখুঁতুনি ছিল না। মনে পড়ছে মায়ের মন্দিরের বারান্দায় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে মনে এতটুকু গ্লানি সে অনুভব করেনি।

না। একটুকু গ্লানি অনুভব করেনি। বরং—। বরং আনন্দ অনুভব করেছিল। ষোল টাকা খরচ করে এসেছিল—ফুলে মালায় ধূপে-প্রণামীতে। পরমহংসদেবের ঘরে গিয়ে গাঢ় ভক্তিতে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে তাঁকে ধ্যান করে একটি স্পষ্ট ধারণা নিয়ে উঠে এসেছিল যে এ নাটকের সাফল্য অনিবার্য। পরমহংসদেবের সেই হাস্যময় প্রসন্ন মুখখানি আরও প্রসন্ন মাধুর্যে ও করুণায় যেন উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল তার সেই ধ্যানের মধ্যে।

মনে পড়ছে বাড়ী ফিরে এসে পেয়েছিল একখানা চিঠি। লেখকের নামটাই আগে দেখেছিল। পার্থ মুখার্জী। পড়েনি চিঠিখানা।

মুড়ে দুমড়ে, তারপর আবার খুলে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

ঢং ঢং ঢং।

তিনটে বাজল। ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে তার শরীরের ভিতর থেকে একটা কাঁপনি বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে—এবং—তার শরীরটা হাল্কা হয়ে যাচ্ছে—দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ভার হয়ে পড়েছে—বুকে যেন একটা দড়ির বাঁধন পড়েছে। আপন মনেই, বোধ করি আপনাকেই, অথবা কাল্পনিক কাউকে সে কোন কথা বলতে চাইলে —মুখও খুললে কথা বলার ভঙ্গিতে; কিন্তু প্রশ্বাসের শব্দের মত বা নীরব হাহাকারে 'হ্যাঁ-এর মত একটা শব্দ ছাড়া স্বর বের হল না তার গলা থেকে।

জেলখানার উপরের আকাশ দিয়ে প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। দূরে সম্ভবতঃ গঙ্গার ধারে কোথাও শেয়াল ডাকছে।

তিনটে বাজার সঙ্গে রাত্রির তৃতীয় প্রহর শেষ হল যে। বাকী শুধু আর এক প্রহর। না, তিনটের পর এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা হলে ছ'টা হয়। কিন্তু ছ'টা পর্যন্তও তার সময় নেই। পাঁচটা। মানে দু'ঘণ্টা।

আর দেহের মধ্যে আত্মা যেন দারুণ উদ্‌বেগে ও অস্বস্তি অনুভব করছে।

—হে ভগবান!

না। কি বলবে সে ভগবানকে? বলবার কথা তো খুঁজে পাচ্ছে না। কোন প্রার্থনা তো তার নেই। আক্ষেপ? তাও নেই। শুধু—। শুধু তুমি বলে দাও—কেন আমি এ কাজ করলাম? কেন? করালে তো তুমি। তুমি ছাড়া কে? কেন তার গলা দিব্যি সেই ক্ষুরখানা দিয়ে কেটে ফেললাম বল তো! কিসের রাগ?

প্রথম অবশ্য তাকে সে ব্যঙ্গ করেছে। সে এই সব ঠাকুর-অবতার এদের মানতো না। এরা ভণ্ড, এরা লোক ঠকায়, টাকা আর সুন্দরী মেয়েদের লোভেই এরা ঠাকুর সাজে, এই ধারণাই তাই বদ্ধমূল ছিল।

এ কালে লেখাপড়া-জানা বি-এ এম-এ পাস করা ঠাকুরও হঠাৎ দেখা দিচ্ছেন। বাজারে হৈ হৈ পড়ছে—ঠাকুর এসেছেন! সমারোহ হচ্ছে। নিত্য আসর বসছে, গান হচ্ছে। ভক্তেরা আসছে দলে দলে। তারপর একদিন ধরা পড়ছে—পুলিস ঠাকুরকে ধরে কেস করছে হয় প্রতারণার অভিযোগ, নয়, কোন সুন্দরী তরুণীকে জাদুর মত কিছু করে ঘর-ছাড়া করার জন্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

আনন্দ ঠাকুর সম্পর্কেও এমনি ধারণাই তার ছিল। ভবেশের বিশ্বাস ছিলও না বটে—আবার ছিলও বটে। থিয়েটারের জন্য অনেকে কিন্তু ঠাকুরের শিষ্য বা ভক্ত হয়ে পড়েছিল।

আশা তার মধ্যে একজন। গল্প আর তার ফুরতো না। নতুন নাটক খুলবার দিন আশা একটা চাঁপাফুল এনে ভবেশকে দিয়ে বলেছিল—এই ফুলটা দিয়েছেন ঠাকুর। ফুলটাকে এক টুকরো নতুন রেশমী কাপড়ের ফালিতে গিঁট দিয়ে স্টেজের কোথাও বেঁধে নিন। ঠাকুর বলেছেন—নাটক তোমাদের খুব চলবে গা আশা।

তা সত্য হল—নাটক সত্যিই খুব চলা চলতে লাগল। কিসের জন্য তা কেউ বিচার করে খতায়নি। সবগুলোকেই সত্যি বলে সবাই মেনে নিয়েছিল। অভিনয় হয়েছে ভাল—লাউড হলেও ভাল হয়েছে। টীম-ওয়ার্ক ভাল এও সত্যি, তার সঙ্গে এও সত্যি যে বিহঙ্গিনীর হিরোইনের পার্ট খুব ভাল। নাটক সম্পর্কে যে যা বলুক নাটক খুব জমাট নাটক এও মিথ্যে নয়। ওই যে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে এসেছিল—পরমহংসদেবের আশ্চর্য এক হাসিমুখ ধ্যানের মধ্যে দেখেছিল সুচন্দ্রা, তার জন্যে এ সাফল্য—সে সত্যকেও অস্বীকার করবে কে? এতগুলো সত্যের পর আশার ওই ঠাকুরটির আশীর্বাদই মিথ্যে কি করে হয়? এ কালের এই ভুঁইফোড় ঠাকুরদের উপর বিশ্বাস নেই সুচন্দ্রার, তবু তাকে মিথ্যে বলতে পারেনি। ভবেশ ম্যানেজারও না।

সেদিন ছিল পঁচিশতম রাত্রি; ঠাকুর সেইদিন এসেছিল অভিনয় দেখতে। শনিবার দিন পড়েছিল পঁচিশতম অভিনয়। চব্বিশতম অভিনয় হচ্ছিল বেস্পতিবারে। আশা এসে ভবেশবাবুকে বলেছিল—

ম্যানেজার সাহেব, শনিবার তো পঁচিশ রাত্রি। জয়ন্তী-টয়ন্তী তো পঞ্চাশের আগে হয় না। তা ঠাকুরকে নেমতন্ন করে আনুন শনিবার দিন। উনি সেই চাঁপাফুল আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন মনে আছে তো। উনিও বলছিলেন—তোমাদের বই তো খুব জমেছে। আমি বলেছিলাম।

ভবেশ ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—তা বেশ তো, বলো। কিংবা নিয়ে এস।

—না-না। তুমি নেমতন্ন করে আনবে। তবে তো।

—তা যাব।

আশা চলে গেলে সে ভবেশকে বলেছিল—তুমি যাবে নাকি? ফাংশন করবে? ভবেশ ভেবে নিয়ে বলেছিল—ফাংশন কি? একগাছা ফুলের মালা। তবে নেমতন্ন করে আসব। করা ভাল। সাধু-সন্ন্যাসী কার মধ্যে কি আছে কে বলবে? কি বলো?

সে চুপ করে ছিল। 'না' কথাটা মুখ থেকে বের হয়নি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। হয় তো অকারণ। হয় তো 'না' বলতে পারেনি বলে। হয় তো, ওই যে প্রথমদিন ঠাকুর তার এ্যাক্‌টিংয়ের নিন্দে করেছিলেন শুনে সে যে মন নিয়ে চলে গিয়েছিল—সেই মনটা রাখতে পারেনি বলে।

ঠাকুর মুখে তার নিন্দে করেছিলেন। কিন্তু কাগজে তার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—আশ্চর্য প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। সমস্ত নাটকটির প্রাণশক্তির মত নিজেকে ক্রিয়াশীল রেখেছেন—প্রতিটি সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে, নাটকের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট বলে ভ্রম হয়। সে দোষ নাটকের। নাট্যকার নাটক করবার জন্য কৃত্রিম ঘটনা-সংস্থানের সৃষ্টি করেছেন—সংলাপও সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই রচনা করেছেন। লক্ষ্য আছে জমিয়ে দেবার দিকে। হাততালির দিকে। সেই ভূমিকা যখনই সেখানে সফল হয়ে ওঠে, তখনই মনে হয় এতটা কেন? তবে অবশ্য সাধারণ দর্শক অত্যন্ত রুচির সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। সেটা মস্ত বিবেচনার কথা।

এদেশের সাধারণ মানুষের যে জাত—সে-জাত তার আপন জাত। আমরা বিদেশী শিক্ষায় যারা মানুষ হয়ে জাত হারিয়ে অন্য জাতে পরিণত হই—তারা কলাফুলের ব্যঞ্জনকে (মোচার ঘণ্ট) সমাদর করতে পারি না। সেটা দিয়ে মোচার ঘণ্ট কি ছানার ডালনা সমাদর হয়ে যায় না। সে সমালোচনা মস্ত আলোচনা।

www.boiRboi.blogspot.com

পরে তার মন পাল্টালো। ভক্তি—? ভক্তি কি? ভক্তির মতই কিছু হল। মনে হল দেখে আসি। ভাল করে বুঝে আসি! সেদিন সকালে প্রমাণ করেছে—সে করেনি। সেটা দিয়ে আসি।

প্রমাণ দিতে তার এতটুকু কুণ্ঠা হয়নি। একবিন্দু না। সুন্দর মানুষ, সবল স্বাস্থ্যবান রূপবান মানুষ, পণ্ডিত লোক চমৎকার কথাবার্তা—কুণ্ঠা হবে কেন? কিন্তু এঁটো মুখ থেকে বের করে দেওয়া চিবুনো পান খেতে সে পারেনি। সারা দেহ-মন পাক দিয়ে উঠেছিল। সে বলে উঠেছিল—ওরে সর্বনাশ?

কথাটা ঠাকুর শুনতে পেয়েছিলেন।

বিচিত্র মানুষ ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে আশাকে বলেছিলেন—শোন! শোন। ঠিক বলেছ মেয়ে! খুব ঠিক বলেছ। গুরুর এঁটো প্রসাদ আর পায়ের ধুলো এতে কিছু নেই রে, এতে কিছু নেই। তুমি ঠিক বলেছ গো।

ভক্তি তার বেড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর সে ভক্তি আরও বেড়েছিল আর একটা ঘটনা থেকে। একজন রাণী এসেছিল কোথাকার। সঙ্গে রাজাও ছিল। পায়ের তলায় নামিয়ে দিয়েছিল মস্তবড় একটা ট্রে। তাতে ফুল, ফল, গরদের জোড়, ফাউণ্টেন-পেন, প্রসাধন সামগ্রী, একটা টাকার তোড়া এবং আরও অনেক কিছু ছিল।

ঠাকুর পা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—না।

তারা হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। ঠাকুর বলেছিলেন—না। নিয়ে যাও।

তারা নড়েনি। হাতজোড় করে বসেই ছিল। ঠাকুর আশ্চর্য শক্ত অথচ শান্ত গলায় বলেছিলেন—তোমাদের আমি জানি।

তোমাদের কোলিয়ারীতে খাদ ধ্বসে কুলী চাপা পড়েছে। মরেছে। তোমার টাকার জোরে আইন আদালতে দিব্যি বেরিয়ে এসেছে। এখন আমার কাছে এসেছ, পাপ থেকে রেহাই পাবার জন্যে। দেখ, পাপ থেকে মুক্তি দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি! তাঁর ঠিকানাও আমি জানি না। কোন পাপে কোন শাস্তি হয় তাও আমার জানা নেই। পাপ হয় কি না তাও বলতে পারি না। তবে যা বললাম সব যদি সত্য হয়—তাহলেও আমি মুক্তি তোমাদের দেব না। কারণ দেওয়া উচিত নয়। নিয়ে যাও এসব উঠিয়ে।

সেই দিনই সে আসবার সময় ঠাকুরের সামনে হাতজোড় করে বলেছিল—আমাকে দীক্ষা দেবেন ঠাকুর?

ঠাকুর হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিলেন—দীক্ষা? দীক্ষা নিয়ে কি করবে? কি হবে?

সে উত্তর দিতে পারেনি। উত্তর খুঁজে পায়নি; চুপ করে বসেই ছিল। ঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—দেখ, অমৃত রাখতে গেলে স্বর্ণপাত্রের দরকার হয়; মাটির পাত্রে হয় না।

একখানা চাবুক যেন পিঠে পড়েছিল তার। নিঃশব্দে অচঞ্চল-ভাবে সে বসেছিল। মুখ নামিয়েছিল শুধু।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে হাত বাড়িয়েছিল ঠাকুরের পা দুখানি ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাবার জন্য। ঠাকুর পা দুখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুচন্দ্রা হেঁট হয়ে পায়ে মাথা ঠেকাবার কথা মনে করেও মাথা ঠেকাতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল। ঠাকুর ডেকেছিলেন—আশা।

—আজ্ঞে—

ঠাকুর বলেছিলেন—নে। বলে মুখ থেকে পানের ছিবড়ে বের করবার উপক্রম করেছিলেন। আশা ডান হাত পেতে বাঁ হাত দিয়ে আবার ডান হাতের কনুই স্পর্শ করেছিল, সে যেন বিগলিত কৃতার্থ

হয়ে গিয়েছিল এই উচ্ছিষ্টের অনুগ্রহে।

এরপর কয়েক দিন সে আর ওদিকে যায়নি। কি দরকার? মনটা যেন কেমন হয়ে গিছল! থিয়েটারে ডুবতে চেষ্টা করেছিল। ভবেশের সঙ্গে ড্রিংক করেছিল। কিন্তু সে ঠাকুরকে ছাড়লেও ঠাকুর তাকে ছাড়েননি। আশা একদিন তাকে বলেছিল—ঠাকুর তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছিলেন—সে কই? এঁ্যা? আমার কাছে তো দীক্ষা চাচ্ছিল। আসতে বলো।

আশ্চর্য—ঠিক পরের দিনই গিয়েছিল সে। গিয়েছিল একা একখানা ট্যাক্সি করে। এবং সহর্ষে সহাস্যে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলেছিল—আমি এসেছি ঠাকুর। ঠাকুর তার ভাগ্যক্রমে একলা ছিলেন।

—এসেছ? আচ্ছা। কিন্তু—।

সুচন্দ্রা হেসে তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেছিল—ভয় হচ্ছিল কিন্তু—।

—কেন? ফিরিয়ে দেব বলে?

ঘাড় নেড়ে সুচন্দ্রা বলেছিল—তা না। ভয় হচ্ছিল মাটির কলসী তো, সোনার কলসীর ধাক্কায় যদি ভেঙে যাই। তা মনই বললে ভয় কি, সোনার কলসীই তো ডেকেছে—

মিষ্টি হেসে ঠাকুর বলেছিলেন—আমি ডেকেছি, কে বলল তোমায়?

—আশা।

—নাও, একটা পান খাও। গোটা পান।

নিজের ডিবের থেকে পান দিয়েছিলেন। নিজের মুখের ছিবড়ে হাতে নিয়ে একটা পাত্রে রেখে দিয়েছিলেন—ভক্তেরা প্রসাদ নেবে তারপর একসঙ্গে দুটো পান নিজের মুখে পুরেছিলেন।

এইবার লোক এসেছিল ক'জন। আসর জমতে শুরু করেছিল। ঠাকুর বলতে শুরু করেছিলেন দেখ, রত্ন মণি-মাণিক্যের প্রদীপ তৈরী করো, সোনার প্রদীপ রুপোর প্রদীপ করো—তাতে জ্বলে সেই

এক আগুনের আলো গো। আলো নিভলে মাটির প্রদীপ হলেও ঘর অন্ধকার সোনার হলেও অন্ধকার। আলোয় আলোয় বিশেষ আছে—কেরোসিনে গন্ধ ওঠে, ঘিয়ের আলোয় অন্য রকম, মোমে অন্য রকম।

সে মস্ত কথা।

ভারী চমৎকার কথা। আর বলবার ভঙ্গিটিও বড় চমৎকার। মন যেন জুড়িয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল সেই দিন সে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করবে। কিন্তু—

যতবার সে উঠতে চেয়েছে—ততবার ঠাকুর বলেছেন—বসো।

শেষবার তিনি ঘরে আর দু'জন যারা ছিল তাদের বলেছিলেন—একটু বাইরে যাও তো তোমরা।

তারা বাইরে গেলে ঠাকুর বলেছিলেন—দেখ, একটা বিষয়ে তোমাকে সচেতন করে দি। তুমি বোধহয় নিজেই জান না। বড্ড বেশি সাজ-গোজ কর তুমি। এত বেশি সেজে-গুজে এখানে এসো না। কেমন? এটা তো তোমাদের থিয়েটার নয়, এটা আমার আশ্রম। হ্যাঁ।

কান দুটো তার মুহূর্তে যেন উত্তপ্ত হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। সেজে-গুজে এসেছে সে? বড্ড বেশি সেজে-গুজে?

* * *

তবু সে ঠাকুরকে ছাড়েনি। ছাড়তে পারেনি। ঠাকুরও তাকে সরিয়ে দেয়নি। মুখ ফিরিয়ে নেন নি।

সে হাতজোড় করে বলেছে—আমাকে পরিত্রাণ করো তুমি।

ঠাকুরও বলেছেন—তোমাকে ত্রাণ আমি করব। কিন্তু—। কিন্তু না পারেননি। সে কোন ক্রমেই এঁটো পান খেতে পারেনি। কোন মতেই সে ভিক্ষুণী বৈরাগিনী সাজতে পারেনি।

চেষ্টা সে করেছে। সে সাদা মিহি মিলের থান পরেছে—রুক্ষ স্নান করেছে। তাতেও আরও তিরস্কার পেয়েছে। ঠাকুর বলেছেন—করেছে কি? শিবের তপস্যাভঙ্গ করবে নাকি। কিন্তু মনে মনে এই-

ভাবে সাজো। বাইরের সাজ তো আমরা দেখি—তিনি তো দেখেন না।

সেদিন বলেছিলেন—বার বার বলে তোমায় পারলাম না। তুমি পাপিষ্ঠা।

তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। খুব অসুস্থ। মাথার শিয়রে বসেছিল সে।

অনেকক্ষণ ছটফট করে ঘুমিয়েছিলেন ঠাকুর। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। সে বসেছিল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর আর সে। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। সুন্দর মানুষটি। কঠোর কঠিন। সত্যবাদী। কিন্তু তার একটা কঠিন আক্রোশ তাঁর উপরে। সেটা যেন ফুঁসছিল—বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল গর্ত থেকে সাপের মত।

হঠাৎ—। একেবারে হঠাৎ চোখে পড়ল—এপাশের টিপয়ের উপর কামাবার সরঞ্জাম! তিনখানা ক্ষুর ঠাকুরের। একটা সেফটি রেজার। দুটো পুরনো সনাতন ক্ষুর। বিলিতি ক্ষুর।

কি হল সে জানে না, বলতে পারে না। ক্ষুরটা সে খাপ থেকে বের করে নিয়েছিল। ক্ষুর হাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বলতে পারবে না। এও বলতে পারবে না—কখন কেমন করে সে ঠাকুরের গলার উপর ক্ষুরখানার ফলাটাকে টিপে বসিয়ে দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টানে এদিক পর্যন্ত কেটে ফেলেছিল।

না—তার মানে নেই।

ঈশ্বর তুমি তো জানো—বলো।

বলো—কেমন করে সে পেরেছিল এবং কেন সে একাজ করেছিল। সে তো ঠাকুরের কাছেই শান্তি চেয়েছিল। তার পায়ে আত্মসমর্পণই তো করতে চেয়েছিল।

ঢং ঢং ঢং ঢং!

চারটে।

শেষ ঘণ্টা। এরপর তার জীবনে আর ঘণ্টা বাজবে না। ভারী

মজবুত জুতোর শব্দ উঠছে।

দরজা খুলছে। চাবি ঘুরছে তালায়।

সে ক্লান্ত অসাড়ের মত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যেন ঢলে পড়তে চাইল। জেলের দরজাটা খুলছে। লোহার দরজা। দরজাটা খুলে গেল।

সুচন্দ্রা দেবী। তোমার—আজ—।

উঠে বসল সুচন্দ্রা বিহঙ্গিনী। বড় ক্লান্ত তবু উঠে বসল। কোন আক্ষেপ নেই, কোন উৎসাহও নেই।—চলো—আমি তৈরী।

পাশের ঘরে বাথটবে জল পড়ছে।

স্নান করতে হবে। তারপর—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আবার একটা। তারই মধ্যে মনে মনে সে প্রশ্ন করলে—ঈশ্বর তুমি বলো।

জমাদার বললে—স্নান করতে হবে—ওঘরে।

সে বললে—চলো।

পাখীরা কলরব করছে। তারই মধ্যে অকস্মাৎ কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—হে ঈশ্বর তুমি বলো। তুমি বলো। মাটির পৃথিবীতে এই তার শেষ গান। রূপসী বিহঙ্গিনী।

———

প্রত্যাখ্যান

www.boiRboi.blogspot.com

রেজিস্টার্ড পোস্টের মোটা একটা প্যাকেট। সুন্দর করে প্যাকেটটি বাঁধা। কাগজের মোড়ক সুন্দর, প্যাকিং সুন্দর, দড়ি সুন্দর, রঙিন শক্ত দড়ি। প্রেরকের নাম দেখলাম। রেভারেন্ড পেঁতা। এক কৃশ্চান মিশন থেকে পাঠিয়েছেন। মিশনের নামটা থাক।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বার কয়েক ঘুরিয়ে দেখলাম। পিওন বললে—রসিদটা।

এ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ শুদ্ধ দেওয়া আছে।

পিওন আবার বললে—বাবু। পিওনের তাড়া আছে। ভর্তি দুপুরবেলা রেজেষ্ট্রী মনিঅর্ডার, বেয়ারিং, ইনসিওর বিলি করে সে। এলাকাটা কত বড় জানিনে—তবে অনেকটা হবে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—তাই তো হে? এ যেন। একটু থমকে থেমে গেলাম। বলতে পারলাম না—রেজেষ্ট্রী করা ব্যাপার কি আছে এতে? নিয়ে কি শেষে কোন ফ্যাসাদ না হোক ফেরে পড়ব।—

পিওন হেসে বললে—বই-টই পাঠিয়েছে হয়তো।

সেই তো বিপদ। বই পাঠান অনেকজনেই। বুক পোস্টেই বেশী আসে। তাতে দায় থাকে না তা নয়, কিন্তু সে দায় স্বচ্ছন্দে ঝেড়ে ফেলা দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানেই বই রেজেষ্ট্রী ডাকে আসে সেখানেই মতামতের জন্যে তাগিদ অবশ্যম্ভাবীরূপে জোরালো হয়ে থাকে। চিঠির পর চিঠি আসে! তার ভাষা তীক্ষ্ন হয় এবং উত্তাপও থাকে। অথচ সত্য মতামত দেওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কোন্ রেভারেণ্ড পেঁতা যাঁর নামের মধ্যে তাঁর ফরাসী পরিচয় সুস্পষ্ট, তিনি বাংলা বই লিখে থাকলে এবং সে সম্পর্কে মতামত চেয়ে থাকলে—তা যে কতখানি কঠিন এবং গুরুভার ব্যাপার হতে পারে তাই ভাবছিলাম। যদি আমাদের ধর্ম এবং সমাজের নিন্দা করে থাকেন—তা হলে জীবনের

শান্তিভঙ্গ করে বাদ-প্রতিবাদে নামতে হবে ! লেখা খারাপ হলে খুব আশংকার হেতু নেই—কারণ সে সহ্যগুণ এবং উদারতা তাঁদের আছে।

ওই উদারতার উপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত পিওনের কাছে কলমটা নিয়ে রসিদ দুটো সই করে তার হাতে দিলাম। এবং প্যাকেটটাকে আর একবার নেড়েচেড়ে অনুভব করে দেখলাম। বইয়ের বাঁধানো মলাট হাত না দিয়েও বোঝা যায়। তবে শুধু বইই নয়—তার সঙ্গে কাগজ আছে।

'রেভারেণ্ড পেঁতা···মিশন। সাঁওতাল পরগণার গ্রামাঞ্চলের একটি মিশন। মিশনটি অনেক দিনের।

অবশেষে খুলে ফেললাম। উপরের মোড়কের নিচে আবারও একটা মোড়ক ছিল, নতুন টোয়াইন সুতো দিয়ে বাঁধন দেওয়াও ছিল। খুলে পেলাম একখানা বাঁধানো খাতা ! বই নয়। বইয়ের মলাটে বইয়ের পরিচয় থাকে তা নেই। তা ছাড়াও বইয়ে এবং বাঁধানো খাতায় যে প্রভেদ থাকে—সে প্রভেদ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হচ্ছিল। কিন্তু খাতাখানা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একখানা রেজেষ্ট্রী করা দলিল। মাঝখানে ভাঁজ করে মোড়া লম্বা সাইজের ডেমি কাগজ—তার মাঝখানে রেজেষ্ট্রী আপিসের গোল রবারস্ট্যাম্পের ছাপ মারা। তার নিচে লাল এবং কালো কালিতে রেজেষ্ট্রী আপিসের দু তিন লাইন মন্তব্য। মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠল। কতকগুলো প্রশ্নই হুড়মুড় করে একসঙ্গে যেন এ ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিজেকে শোনাতে চাইলে। দলিলখানা তুলে নিলাম।

ভাজটা খুলে দলিলখানা চোখের সামনে ধরে চমকে উঠলাম। প্রথমেই চোখ পড়ল দলিল সম্পাদনকারীর নামের দিকে : সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে—শ্রীসুকুমার চৌধুরী।

সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ? সুকুমার চৌধুরী ?

দলিলটার মধ্যে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে চোখ বুলিয়ে গেলাম। দলিল-খানা উইল। উইল করেছে সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে সুকুমার।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তীর্ণ খোয়াই এবং প্রান্তর পড়ে ছিল এককালে। সেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় দেড়শো বিঘা—আজকে যাকে বলে পঞ্চাশ একর—জমি দখল করে বসে প্রায় অর্ধেকটার উপর বাগান করেছিলেন এবং বাকী অর্ধেকটা মাটির মোটাপগার দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই পতিত অংশ থেকে এককালে পনের বিঘা অর্থাৎ পাঁচ একর জমি আমি পাঁচ টাকা বিঘা সেলামী নিয়ে সুকুমার চৌধুরী নামক একজন ডেটিন্যুকে মোকরবী মৌরুসী বন্দোবস্ত করেছিলাম। সুকুমার ডিটেনশন থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে বসবাস করেছিল নিজে করত ডাক্তারী—মেডিকেল কলেজ ফিফ্‌থ ইয়ার পর্যন্ত পড়া ছেলে ছিল সুকুমার। তা ছাড়া এখানে খানিকটা চাষ খানিকটা পশুপালন তার সঙ্গে খানিকটা গোলাপ বাগানও করেছিল সে এবং কিছুকালের মধ্যেই এ অঞ্চলটিকে তার প্রায় সাম্রাজ্যে পরিণত করে ফেলেছিল। মুকুটহীন সম্রাট বা রাজা বলে একটা কথা জানাই ছিল তখন পর্যন্ত চোখে দেখিনি। প্রথম তার চেহারাটা দেখেছিলাম—সুকুমারের মধ্যে। এ অঞ্চলের জমিদার-ধনী-মহাজন-ব্যবসাদার-জোতদারদের সমবেত বাধাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে দেশের মানুষের যাকে বলে বুকের ওপর সিংহাসন পাতা তাই পেতে সগৌরবে চেপে বসেছিল।

* * *

আমাদের গ্রাম প্রায় আড়াই শো বছর ধরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেকালে—নবাবী আমলে এখানে নদীর ঘাটে বন্দর ছিল। নদীর ঘাটটার নাম এখনও নৌকাঘাটা এবং ঘাটের উপরেই যে একটা উঁচু ঢিবি আছে—যার পরিমাণ হবে বিঘা পাঁচেকেরও বেশী—সেটার নাম এখনও বন্দর ঢিবি।

নদীর ঘাট থেকে গ্রামের মধ্যে আধ মাইলের মত দূরত্ব আছে। গ্রামেও বাজার আছে। একটা লাল মোরামের পাকা রাস্তা এই অঞ্চল জুড়ে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে ; আমাদের গ্রামের মধ্যেও এই রাস্তাটী গোটা তিন-চার হাঁটুভাঙা দ-য়ের মত এঁকে বেঁকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তাটার

উপর অর্থাৎ দু'দিকে বাজার আছে বরাবর। মিষ্টির দোকান, তেলেভাজার দোকান, কাপড়ের দোকান, গোলদারি দোকান তার সঙ্গে মণিহারী ছোটতে-বড়তে দু'তিনখানা।

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের আমলে দরজীর দোকান হয়েছিল। তিনুমিয়া সাহেব কালী ময়রার বাড়ীর একটা বারান্দায় চোখে চশমা পরে সেলাইয়ের কল চালাতেন, বাঁ পাশে একটা টুলের উপর থাকত তাঁর ফুরসি। ফুরসির নলটা লাগানো থাকত তাঁর মুখে। কলও চলত এবং ফুরসিও ডাকত। তার সঙ্গে তাঁর মাখানো তামাকের কারবার ছিল। হীরু রৈরাগীর ছোট মণিহারীর দোকান ছিল—চুড়ি, ছোট টিনের আয়না-কাঁকুই মাদুলী, সস্তা তেল প্রভৃতি পাওয়া যেত। কাঁচিমার্কা সিগারেট এবং গোটা পান, কলিচুন বেচত হীরুর বড় মেয়ে মোনা—মনমোহিনী। তার সঙ্গে সে পানও তৈরি করে বেচত। চন্দ্র মশায়ের গোলদারি দোকান ছিল, মস্ত দোকান। সন্ন্যাসী দত্তের দোকানও বড় ছিল, তবে তাঁর বড় ছিল ধানচালের কারবার।

এই বাজারের ঠিক মাঝখানে আছে থানা। গ্রামে পোষ্ট আপিস ছিল, রেজেষ্টী আপিস ছিল—এখনও বেশ কলেবর বাড়িয়ে রয়েছে। আরও অনেক সরকারী আপিস হয়েছে এখন, কিন্তু কথা এখনকার নয়। কথা সেই সাতাশ আঠাশ সালের। এই মুহূর্তে এই রেজিস্টার্ড পার্শেলের ভিতর থেকে পাওয়া দলিলখানি চোখের সামনে ধরে আমার মন চলে গেছে সেই ১৫২৭ সালে। চলে গেছে আমাদের গ্রামে, বাজারের ভিতরের সড়কটার ঠিক মাঝ বরাবর—উত্তর দিকে থানা, থানার পশ্চিম গায়ে একটা গ্রাম্য রাস্তা বেরিয়ে গেছে ঠাকুর পাড়া। রাস্তাটার ওপাশে পশ্চিমে মিছারাম মোদকের দোকান এবং বাড়ী। ১৯২৭ সালে মিছারাম বা তার স্ত্রী জীবিত ছিল না। তাদের ছেলেপুলে ছিল না বলে বাড়ীটা পেয়েছিল তার ভাইপোরা। তারা বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছিল গভর্ণমেণ্টকে। থানার পাশেই—দারোগা-বাবুদের চোখের উপর—এই বাড়ীটার ডেটিন্যু থাকত।

বাড়ীটার নামই হয়ে গিয়েছিল 'নজরবন্দীখানা'। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই নানান নামের রকম ফেরের মধ্য দিয়ে—বিনা বিচারে আটক চলছে। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাক্ট বা রুল রাউলাট এ্যাক্ট, এমনি কত নাম। ডেটিনু প্রথম এসেছিলেন সুশীলবাবু—আমাদের থেকে বড় ছিলেন তিনি। অসীমবাবু, সোমনাথবাবু, অনন্তবাবু, অতীনবাবু, নরেশবাবু, তারপর একদিন এল এই সুকুমার চৌধুরী।

সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে। বছর বাইশের বেশী হবে না বয়সে। বীরের মত চেহারা। একসারসাইজ করা শরীর দেখেই বোঝা যায়।

আমার উপর পুলিশের দৃষ্টি ছিল। মেলামেশার সহজ পথটা নিরাপদ ছিল না। তবুও ডেটিনুদের আমার সঙ্গেই আলাপ হত সর্বাগ্রে।

কেমন করে যে তাঁরা খবর নিয়ে আসতেন তা বলতে পারিনে—তবে হয় তাঁরা নিজেরাই আসতেন আমার বাড়ীতে নয়তো কোন-না কোন লোক এসে বলত—নতুন নজরবন্দীবাবু আপনার খোঁজ করছিলেন। তেমন-তেমন থানা অফিসার সে-কালেও ছিলেন যিনি আমার বাড়ীর পাশের ষ্টেশন যাবার রাস্তাটা ধরে যাবার পথে হেঁকে বলে যেতেন—নতুন একটি ভদ্রলোক এসেছেন ডেটিনু। একবার যাবেন। অথবা নিজেই ডেটিনুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতেন—'আছেন নাকি মশায়?' এবং আলাপ করিয়ে দিয়ে—চা খেয়ে উঠে দাঁড়াতেন। হেসে বলতেন—যাবেন আপনি। এখন যদি গোপন কথা-টথা থাকে—বলে নিন। তবে দেখবেন—যা, রয় সয়, তাই করবেন।

সুকুমার সকলের থেকে আলাদা। সেটা সে প্রথম আলাপ থেকেই প্রমাণ করেই আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমার বাড়ীতে সে একেবারে একলা এসে হাজির হয়েছিল। সে-সময় আমাদের দেশে প্রবল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। পুরনো কালের বর্ধমান

নদীয়ার মত অবস্থায় প্রায় এসে পেঁাচেছিল। পেটে পিলে এবং জীর্ণ হাড় বের-করা বুক ও যেমনই রঙ হোক—তার উপর কালো ছাপ-পড়া রঙ এই ছিল সার্বজনীন অবস্থা। সেদিন আমার তিনদিন জ্বর বা জ্বরের তৃতীয় দিন। টেম্পারেচার উঠেছে—একশো চারের উপরে। বিছানায় শুয়ে ছট-ফট করছি। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। বেলা বিকেল পাঁচটা। আমার বড় ছেলে এসে বললে,—একজন খুব সুন্দর ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম—বাবার জ্বর হয়েছে—তো বললে—বলগে, আমি ডাক্তার।

ডাক্তার। কে ডাক্তার আমাকে দেখতে এল উপযাচক হয়ে? কথাটা একটু বিভ্রান্ত করেছিল—উদ্‌বিঘ্নতায় বিভ্রান্ত করেছিল তা বলছিনে—তবে একটু ধাঁধা লাগিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল, অর্থাৎ কি উত্তর দেব ভাবছিলাম—। কিন্তু তার আগেই মা একটি প্রিয়দর্শন তরুণকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তরুণটি মাথায় একটু বেশি উঁচু—আমার পুরনো আমলের মাটির দোতলার পাঁচ ফুট দরজার মাথার চৌকাঠে মাথা ঠুকে—'বাপরে' বলে ঘাড়টা হেঁট করেছিলেন। পরক্ষণেই হেসে উঠে, বলেছিলেন—করেছেন ভাল। মাথা উঁচু করে ঢুকবার জো নেই।

মা বলেছিলেন,—কেটে-টেটে যায়নি তো বাবা? দেখি?

আগন্তুক বলেছিলেন,—কেটে গেলে মন্দ হবে না। দিব্যি ওই বাড়ীটার নাম দিয়ে চালিয়ে খানিকটা হুজ্জৎ করা যাবে। হুজ্জৎ না করলে জমে না—দিন কাটে না।

মা বলেছিলেন,—উনি এখানে ডেটিনু হয়ে এসেছেন। ডাক্তারী পড়তেন—

বাধা দিয়ে আগন্তুক বলেছিলেন, এই দেখুন। আমি বললাম—আপনি আমার মা হবেন এখানে আর আপনি আমাকে ন-কার লাগিয়ে কথা বলছেন?

এরপর আমার বিছানায় বসে পড়ে বলেছিলেন,—আমার নাম সুকুমার চৌধুরী। আপনার নাম আমি জানি কিন্তু এ করেছেন কি বলুন তো? একেবারে জ্বরে কাৎ হয়ে পড়ে আছেন!

বলেই আমার কপালের উপর হাত রেখে একটু যেন চমকে উঠে বলেছিলেন, ওঃ এ যে টেম্পারেচার খুব চড়ে গেছে।

কপাল থেকে হাত সরিয়ে আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে নাড়ী ধরেছিল। বলেছিল, আমি থ্রি ফোরথ্ ডাক্তার কিন্তু ঠাকুরদা কবরেজী করতেন—বাবা কবরেজী-কাম-ডাক্তার ছিলেন—তাঁরা নাড়ী দেখতেন খুব ভাল। বদ্যির বাড়ী, আমাদের মেয়েরাও হাত দেখতে জানেন। আমি হাত দেখতে জানি খুব ভাল। যা বলব নাড়ী দেখে তাই থারমোমিটারে উঠবে।

তাই হয়েছিল। নাড়ী দেখে সে বলেছিল—জ্বর পাঁচ ছাড়িয়ে গেছে।

থারমোমিটারেও তাই উঠেছিল একশো পাঁচ পয়েণ্ট দুই ছাড়িয়ে একটু। এরপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল কিছুক্ষণ এবং গরম জল তৈরি করিয়ে সারা দেহটাকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে ভাপ দিয়েছিল—তারপর মুছিয়েও দিয়েছিল। পা দুটিকে জল-ভরা গামলায় কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে মুছে মোজা পরিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল; মাথা-কপালে ঘটি তিন-চার জল ঢেলে ধুইয়ে-মুছিয়ে দিয়ে টেম্পারেচার কমিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিল—একশো চারে।

তারপর বলেছিল,—একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

ঘুম আমার আসেনি। এখানে সুকুমার পারেনি—হেরেছিল। হেসে বলেছিল,—অত্যন্ত সেনসিটিভ নার্ভ আপনার। আপনার ঘুম আনা সহজ নয়। জ্বর কমতে শুরু করবে তবেই ঘুম আসবে।

তারপর বলেছিল,—উঠলাম আজ। কাল ভোরে খোঁজ নিয়ে যাব। জ্বরটা বোধহয় তখনই ছাড়বে।

বুকপকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখে বলেছিল সাতটা। দু'ঘণ্টা

হয়ে গেছে। আপনার এই হাতখানা কিন্তু আমি নিয়ে যাচ্ছি।

একখানা বাঁধানো একসারসাইজ বুকে একখানা নাটক লিখেছিলাম। ঐতিহাসিক নাটক। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে লেখা। জলের গেলাস ঢাকা দেওয়া ছিল খাতাটা দিয়ে ; সেটাকে যে সে কখন খুলে দেখেছিল তা জানি না, তবে সে দেখেছিল এবং কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখেও ছিল এরই মধ্যে তার প্রমাণ সে দিয়ে গেল। বললে,—গানগুলিও আপনার লেখা নাকি ? ওই 'আমার মাধুরী—তোমার নয়নে মধুর করিয়া নাও।'

বলেছিলাম হ্যাঁ।

—ভাল লাগল।

—সুরও বেশ ভাল।

—আপনি গান গাইতে পারেন নাকি ?

—না। ওখানে একেবারে নিরক্ষরের সামিল।

—তবে ? সুর দিল কে ?

—ওই যে পার্টের মুখে ওই গান—

দ্বিতীয় আলমগীরের নাতনী—ছেলেরা—

—হ্যাঁ।

ঐতিহাসিক চরিত্র তো নয় ?

—না। কাল্পনিক।

—হজরৎ বেগমকে আনেননি কেন ? মহম্মদ শাহের বেটী ?—যাকে আমেদ শা আবদালী জোর করে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল ?

—যখন লিখেছিলাম—তখন হজরৎ বেগমের খোঁজ পাইনি। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে ! পড়েন ডাক্তারী। আওড়াচ্ছেন ইতিহাস !

—ইতিহাস আমার ফেব্‌রিট সাবজেক্‌ট। ভারী ভাল লাগে।

এর পরই সে সেদিন চলে গিয়েছিল। গানের সুর নিয়ে যে প্রশ্নটা করেছিল তার উত্তর পাবার কথা বোধকরি তখন ভুলে গিয়েছিল সে।

ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ডিটেনশন আইনে সন্ধ্যার পর ডেটিন্যুর বাইরে থাকবার অধিকার ছিল না। ছেলেটিকে অসমসাহসী বা বেপরোয়া বলে সেইদিনই চিনেছিলাম এই ঘটনাটি থেকেই।

তবে ছেলেটির মধ্যে আরও কি আছে, যার জোরে মানুষকে জিতে নিতে ওর দেরি লাগে না।

॥ ২ ॥

তখনকার গান কাজী নজরুলের গান। গলা ছিল ভাঙাভাঙা। এবং মোটা। তবে প্রাণ ঢেলে গাইতে পারত। গানও বুঝত। একটা সহজাত সুরবোধ ছিল। মিছারাম ময়রার বাড়ীর বারান্দায় তার দু'পুরুষের পুরনো খুব মজবুত একটা বেশ লম্বা-চওড়া তক্তপোশ ছিল। যেটা নিয়ে মিছারাম মেলায় যেত—তার উপর মিষ্টির দোকান সাজাত এবং অন্য সময় বারান্দায় পাতা থাকত—তারই উপর মিছারাম তার বাক্স এবং খাতা নিয়ে বসে থাকত। খদ্দেররাও এসে এই তক্তপোশে বসত। সেই তক্তপোশখানা সমেতই ভাড়া নিয়েছিল গভর্ণমেণ্ট, ডিটিন্যুরা যে এসেছে সেই এটার উপর বসত। সুকুমার এটাকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করত। দুই হাতে তক্তপোশ বাজিয়ে গান গাইত—'কারার ওই লৌহকপাট' এবং 'ভেঙে ফেল করবে লোপাট' গাইবার সময় তক্তপোশটাকে ভেঙে ফেলতেই চেষ্টা করত। তবে—'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ—নবযুগ ওই এল ওই'—গানখানা গাইতে গাইতে অভিভূত হয়ে পড়ত। আবার 'কে বিদেশী মন উদাসী'ও ছিল। সুকুমারের প্রিয় গান—বাঁশের বাঁশীও বাজাত সুকুমার।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—সত্যি ক'রে বলতো তোমায় ধরলে কেন? কাদের সঙ্গে যোগ তোমার?

—কেন? সে শুনে কি করবেন?

বলেছিলাম—না-বল শুনতে চাইব না। কিন্তু তুমি ঠিক কোন পার্টির লোক বলে আমার মনে হয় না।

—কেন ?

—তুমি সেদিন নিজেই বলেছিলে—পার্টি-ফার্টি আমার ভাল লাগে না। দাদাদের মন জুগিয়ে চলা আর দেশের সেবা করা এক কথা নয়! আমি দেশের সেবা করতে চাই। দাদাদের চরণোদক খেয়ে আমি স্বর্গে যাব না।

কথাগুলো সুকুমার বলেছিল একদিন।

সুকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল,—খুব নোট করে রেখেছেন তো।

বলেছিলাম,—তা রেখেছি। তা ছাড়া—

—কি তা ছাড়া ?

—জেলা কংগ্রেসের ওরাও খবর দিতে পারেন নি তুমি কোন্ পার্টির লোক। ওরা বললেন,—মুর্শিদাবাদের বৈদ্যবাড়ীর ছেলে—ওদের সঙ্গে মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এইটুকু জানি।

মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের বাড়ী বিখ্যাত বংশ। ওঁদের বাড়ীর ছেলেদের নাম শুনেছি; বালেশ্বরের নীরেন দাশগুপ্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ওই বাড়ীর ছেলে, তাঁদের বাড়ীর আরও ছেলেরা সেকাল পর্যন্ত এই দেশসেবার এবং দেশোদ্ধারের অবিচলিত সংকল্পে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের সঙ্গে সুকুমারদের সম্পর্ক থাকাটাই যথেষ্ট হয়তো। তবুও জেলা কংগ্রেসে থেকে আমার মত যারা কর্মী তাদের মনে প্রশ্ন না-জেগে পারেনি। ওই বংশের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে সে কোন গ্রুপের এ কথাটা স্পষ্ট নয় কেন ? কথাটা সেই হিসেবে মনকে উদ্‌বিগ্ন করেছিল, সেদিন বলেই ফেললাম। কথাটা হয়তো জিজ্ঞাসা করা নিয়ম নয়—তবু এমন ক্ষেত্র আসে যেখানে নিয়ম থেকে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে।

সুকুমার বলেছিল,—ঠিক কথা। প্রশ্ন জাগবার কথা বটে।

আমি বলেছিলাম,—কিছু মনে করলে না তো ?

হেসে উঠেছিল সুকুমার। বলেছিল,—কিছু মনে করাকরির মধ্যে আমি নেই। তবে আমার উত্তর শুনে বিশ্বাস করেন তো বলি। না-করেন তো বলে কি করব? বলুন?

—বল আমি বিশ্বাস করব।

—কথাটা ঠিক—আমি দাদা কোন দলের-টলের নই। দল আমার ভালও লাগে না। পুলিশ আমাকে কেন ধরেছে—তা পুলিশই জানে। বোমা আমি দেখিনি। পিস্তল দেখেছি কিন্তু ছুঁইনি। তবে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিলাম। ম্যাট্রিকে তিনটে লেটার পেয়েছিলাম। আই-এস-সিতে স্কলারশিপ পেয়ে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিলাম। ইস্কুলে যখন পড়েছি তখন আমি একটা সেবা-সমিতি অরগানাইজ করেছিলাম। তাতে খুব নাম হয়েছিল। দশ-বারোখানা গ্রামে আগুন লাগলে—আমাদের 'অগ্নি যোদ্ধাদের নিয়ে ছুটে যেতাম। কলেরা হলে সেবাব্রতীদের নিয়ে গ্রামে আড্ডা গেড়ে সেখানে কাজ করতাম। ম্যালেরিয়ার সময় পুকুরে-ডোবায় কেরোসিন ছড়াতাম। ওই 'অগ্নি যোদ্ধা' নামটাই বোধহয় মহাপণ্ডিত 'আই-বি'দের বিচলিত করেছিল। অগ্নিযুগ শব্দটার সঙ্গে মিল থাকার জন্যে আর গাই-না বলদ বিচার করেননি। তাছাড়া থানা অফিসার থেকে একেবারে ডিষ্ট্রিক্ট আই-বি ইন্সপেক্টার পর্যন্ত কাজ দেখাবার মওকা পেয়েছিল—তারা ছাড়বে কেন। আমার নাম খাতায় তুলে সার্বিস-বইয়ে দু-ছত্র মূল্যবান মন্তব্য সংগ্রহ করেছিল। অতঃপর কলকাতায় মেডিকেল কলেজে এসে 'সুকুমারের পাখা গজাল'। হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছিলাম। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে—সর্বত্র বাণের আগে 'হাদির' মত সুকুমার থাকতেন। প্রফেসাররা ভালবাসতেন। বলতেন—একটু সাবধান হও সুকুমার। কিন্তু কাকে বলছেন? কে শুনছে? কথাটা একটু খুলে বলি? পুলিশ-টুলিশের কেউ কলেজ হসপিটালে এলে আমার স্বভাব ছিল খানিকটা টীজ করা। ফাঁক পেলেই মানে একটু সুযোগ পেলেই ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দিতাম। কেটেকুটে গেলে ব্যাণ্ডেজ করবার

সময় টিঞ্চার আইডিন-টাইডিন প্ররোগের সময় যাতে বেশি জ্বালা করে তেমনি ধরনের ব্যবস্থা করতাম। তারপর ইনজেকশন দেবার সময় ভোঁতা নিড্‌ল নিয়ে যতখানি পারি দুঃখ দিতাম। এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট মহাত্মা ব্যাপারটা নিয়ে উপরে নাড়া-চাড়া করেন। লোকটার পায়ে চোট লেগেছিল। হাড়-টাড় ভাঙেনি। আমি তার পা প্লাস্টার করে দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে দড়িতে ওজন ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলাম। তারপর পেট টিপে দেখে বলেছিলাম মলে ভর্তি হয়ে আছে পেট। ক্যাস্টর অয়েল খাওয়াই। ভাল ছাত্র ছিলাম এবং উটের মত সর্বত্র নাক গলানো অভ্যাস ছিল। মাস্টাররা ভালবাসতেন, এগুলো করতাম আমি। যোগ্যতার সঙ্গে করতাম। লোকটা বলেছিল—হ্যালো ডক—এ তুমি কি বলছ? আমি যে মাসে একদিন ক্রুশেন খাই। আমি ওদিকে খুব পার্টিকুলার। এই তো গত সপ্তাহ আমার ক্রুশেন সপ্তাহ গেছে। আমি তার পেটটা আবার টিপে দেখে বলেছিলাম—মিস্টার—এ তোমার বিসুবিয়াসের মত ফিউরিয়াস এ্যাণ্ড ফেরোসাস হয়ে রয়েছে। এতে সুকুমারের সঙ্গে আমার কতকগুলি আশ্চর্য মিল ছিল। সে-মিল ওই কর্মসূত্রের বা কর্মপন্থার। নিজের জীবন সম্পর্কে সুকুমার যে কথাগুলি সেদিন আমাকে বলেছিল সে কথাগুলির সঙ্গে আমার জীবনের কথা আশ্চর্য মিলে যায়। আমার জীবনের প্রারম্ভে নিতান্ত কৈশোরে ১৮০৮-৯ সালে আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রথম নব-জীবনের নব যুগের সাড়া জেগেছিল। তার প্রকাশ হয়েছিল একটি সেবাধর্মী সংগঠনের মধ্যে এবং আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে হয়তো কথাগুলো খুব ভারী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভঙ্গির হয়ে গেল। সহজ করেই বলা ভাল। দরিদ্র-ভাণ্ডার নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন নিত্যবাবু। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে রবিবার রবিবার পাড়া ঘুরে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল আদায় করা হত। সাতদিনের মুঠো চাল একটা ভাঁড়ে জমা করতেন গৃহস্থেরা। সেই চাল জমা থাকত আমাদের গ্রামের মণ্ডল

ফকীর মণ্ডল মশায়ের দোকানে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দিলে গরীবেরা অনাহারের সম্মুখীন হত। তাদের সাহায্য করা দরিদ্র-ভাণ্ডারের কাজ। মধ্যে মধ্যে এককালের সম্পন্ন গৃহস্থরা দুঃখে পড়তেন—তাঁদেরও সাহায্য করা হত। এ ছাড়াও সারা বাংলাদেশের মধ্যেও দুর্ভিক্ষে-অভাবে সাহায্য পাঠাতেন। আর একটি প্রতিষ্ঠান—গ্রাম্য থিয়েটার। তার সঙ্গে লাইব্রেরী। দুটির সঙ্গে আমার জীবনের নিবিড় সংযোগ অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল। তবে দরিদ্রভাণ্ডারের ক্ষেত্রে আমি ছিলাম বলতে গেলে একেশ্বর।

ছেলে-বয়স থেকে মুষ্টিভিক্ষা আদায়ের দলে ছিলাম একমাত্র অক্লান্ত জন। পনের-ষোল বছর বয়সে একদিন দেখলাম আমার বেশি বয়সীরা কেউ নেই দরিদ্র-ভাণ্ডারে। তাঁরা কেউ কলেজে পড়েছেন—কেউ চাকরীতে ঢুকেছেন, কেউ গ্রামেই ঘরে বসে জমি-জমা দেখেছেন—এবং থিয়েটারের মধ্যে ঢুকেছেন। এবং আমার সমবয়সীরাও ঠিক এই দরিদ্র-ভাণ্ডারের কাজে আর সাহস পাচ্ছেন না। ইস্কুলের মাস্টার মশায়েরাও সাবধান করছেন সকলকে—বলেছেন, ওতে যেয়ো না। পুলিশের নজরে পড়বে। সে-দিন কি জানি কোন্ সাহসে বা আকর্ষণে চৌদ্দ-পনের বছরের উর্ধ্ব-বয়সীদের মধ্যে একমাত্র আমিই দরিদ্রভাণ্ডারকে ছাড়তে পারিনি। সেদিন আমিই আমার ছোট-বয়সীদের মধ্য থেকে একটি আট-দশ জনের দল গড়ে দরিদ্র-ভাণ্ডারের ভার নিয়েছিলাম। শুধু ভার নেওয়া নয়, দলটিকে ক্রমে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বড়ও করে তুলেছিলাম।

আমাদের দেশে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের বাড়ী। এবং বাড়ীগুলি সব ঘন সন্নিবিষ্ট। গ্রীষ্মকালে আগুন লাগত। মানুষেরা এখানে জুটত এবং আগুনের সঙ্গে লড়াই করত প্রাণের দায়ে। এই লড়াইয়ের জন্য একটি দল গড়েছিলাম আমি। বেশি কিছু করতে হয়নি—ভিক্ষে করে টাকা সংগ্রহ করে গোটা পনের বালতি কিনে-ছিলাম। আশেপাশের গ্রামে কোথাও আগুন লাগলে সে বালতি

নিয়ে পনের-কুড়িটি ছেলে ছুটত। পল্লীগ্রামে আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ে অভাব হত জল তোলার পাত্রের। এঁটো হাড়ি টেনে বের করতে হত লোকের হেঁসেল থেকে। তাও মাটির হাঁড়ি—ক্রমাগতই ভাঙত। সেই ক্ষেত্রে বালতির আবির্ভাব চমক লাগিয়েছিল সেদিন। এবং নাম হয়েছিল দরিদ্র-ভাণ্ডারের। ক্রমে বালতি হয়েছিল পঞ্চাশটি। ছেলেরাও হয়েছিল দলে ভারী। আশপাশ গ্রাম ছেড়েও দূর-দূরান্তরে ছুটত তারা। পঞ্চাশ-ষাট বা তারও বেশি সংখ্যক ছেলে যখন বেশ লাইনবন্দী হয়ে বালতি নিয়ে গ্রামান্তরের মধ্য দিয়ে মাঠ ভেঙ্গে আরও দূরের গ্রামান্তরে ছুটত তখন সে একটা দৃশ্য হয়ে উঠত। ফিরবার সময়ও তারা ফিরত লাইনবন্দী হয়ে এবং মার্চের ভঙ্গিতে ফিরত। এটা শুধু পুলিশের নয় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী বা রেভলুশনার বা এনার্কিস্ট যারা তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্রমে দরিদ্র-ভাণ্ডার রূপান্তরিত হয়েছিল সোস্যাল সার্ভিস ইউনিয়নে। এতে কাজও বেড়েছিল। ম্যালেরিয়ার সময় ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজ এবং কলেরার সময় এ্যাণ্টি-কলেরা কাজ এসে ঘাড়ে চেপেছিল। এসবগুলি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে সুকুমার চৌধুরীর পায়ের ছাপ আঁকা পথের প্রতিটি বাঁকের সঙ্গে আমার পথের ও পথের বাঁকগুলির আশ্চর্য মিল আছে। যাক, মিলের কথা বলতে গিয়ে সম্ভবতঃ নিজের কথাই এক কাহন বলা হয়ে গেল।

গরমিল এর পর থেকেই।

সুকুমার মাদারীপুরের দাশগুপ্তদের আত্মীয়। তাদের টানেই বোধকার ওদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে ধরেছে। এই অংশের কথা সুকুমার আমাকে ঠিক বলেনি। আমি আমার কথা বলেছি—সেই দাবিতেও তার ওপর জোর ঠিক করিনি। কারণ আমার সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সামান্য যোগাযোগ ১৯২১ সালের আগে হয়েছিল—১৯২১ সালে গান্ধীজীর আদর্শ তাকে প্রায় মুছেই

দিয়েছিল। সুকুমারের তা নয়। সেই কথাটা প্রমাণ করেই সে একদিন ওই ডেটিন্যু হয়ে থাকতে থাকতেই দস্তুরমত একটা রক্তাক্ত সংগ্রাম করে ফেললে। নিজে ডান হাতের উপরের অংশে অর্থাৎ বাহুতে ছুরি খেলে কিন্তু তার ঘুষিতে একজন কনস্টেবলের নাকটা এবং ডান চোখটা এমন জখম করে দিলে যে তাকেও হাসপাতালে যেতে হল। সুকুমারেরও সঙ্গে যেতে হল। আর একজনও ছিল—সে গ্রামেরই একজন মন্দ চরিত্রের লোক। পুলিশের খাতায় দাগী আসামী।

সকাল বেলা আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে গরুর গাড়ীতে চড়ে সিউড়ি হাসপাতালে যাবার সময় সুকুমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত দেখিয়ে বলে গেল জানি না ফিরব কি না। যদি না-ফিরি তবে এইটেই বিদায়-সম্ভাষণ। তবে মশায় ওই হাসির গল্পগুলো লিখবেন। যেন ছেড়ে দেবেন না। পূর্ণিমা কাগজখানা যেন উঠে না যায়।

বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। গত রাত্রে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ওর ওপরের ঘরে বসে নতুন লেখা হাসির গল্প—ভালচার ক্লাব—শকুনি-সঙ্ঘ শুনিয়ে এসেছি সুকুমারকে। সুকুমার হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল। এরপর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে ঘটেছে ঘটনাটা। এক্ষেত্রে বিস্ময়-বোধটা অবশ্যম্ভাবী। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে সেটা আমার বেশিই হল।

সুকুমারের বাসা, অর্থাৎ ডেটিন্যুর বাসাটা যাকে ওখানকার লোকে বলত নজরবন্দীখানা—সেটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পাকা সড়ক-টার উত্তর দিকে। বাড়ীটার পূর্ব গায়ে ঠাকুরপাড়া যাবার একটা কুশী রাস্তা চলে গেছে উত্তর মুখো। তার পূব গায়েই থানা। রাস্তার দক্ষিণ দিকে নজরবন্দীখানার সামনা-সামনি 'হরে বৈরাগীর বাড়ী'। তার পিছনে হালদার পুকুর। হালদার পুকুর বেশ বড় পুকুর। চার পাড়ের মধ্যে তিনটে পাড়ে বসতি। এবং অনেকগুলি ঘাট। উত্তর দিকের ঘাটটা একটা একটা বড় ঘাট। পুরোপুরি পাকা সড়কের ধারে হলেও সেকালে এই ঘাটেই মেয়ে-পুরুষে স্নান করে, বাসন মাজে,

রান্নার এবং অন্য সব ব্যবহারের জল নেয়। এই ঘাটটাই নজর-বন্দীখানা নামক মিছারাম ময়রার বাড়ীর ঠিক সামনে পাকা সড়কের দক্ষিণে। একটু আড়াল আছে কয়েকটা তাল গাছের, নইলে ডেটেন্যু-বাসার বারান্দায় সেই পুরনো ভারী তক্তপোশটায় বসলে ঘাটের কিছুটা অংশ নজরেও পড়ত। বাড়ীটা কোঠা-ঘরের বাড়ী—দক্ষিণ দিকের কোঠার অর্থাৎ মেটে দোতলার দক্ষিণের জানালাটা খুললে গোটা ঘাটটা একেবারে অনাবৃত অবস্থায় দেখা যেত। ব্যাপারটা লোকেদের চোখ এড়ায়নি, যখন থেকেই বাড়ীটায় ডেটেন্যু এসেছেন তখন থেকেই জানালাটাকে পেরেক পিটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিয়েছিলেন বোধহয় দ্বিতীয় ডেটেন্যু—সেটা ১৯২৩-২৪ সালে। তবে ঘরখানা টিনের ঘর। উপরতলার ঘরখানা টিনের, গরম এবং ঠাণ্ডার জন্য অব্যবহার্য। কেউ বাসই করত না। তবে আমি জানি—ওই ঘরে যিনিই ডেটেন্যু থাকতেন তিনিই ওই উপরতলার ঘরটাকেই—আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রুম হিসেবে ব্যবহার করতেন। গোপনে রাজনৈতিক কর্মীরা আসতেন—তাঁরা ওই উপরের ঘরের অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকতেন এবং ওখানে বসেই পরামর্শ সেরে চলে যেতেন।

এই ঘাটের উপর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় এই মারপিট হয়েছে। সাব-ইন্সপেক্টার বললেন—এ ওই কনেস্টবল আর ওই বদমাস বেটারই পেজোমি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। থানার একেবারে সামনে। রাত্রি দেড়টা তখন। একটা মেয়ে-গলার চীৎকার উঠল। আমি জেগেছিলাম তাই রক্ষে। না-হলে আরও বিশ্রী কিছু ঘটত! ছুটে গিয়ে দেখলাম—কনেস্টবলটা তো দুই হাতে নাক ধরে খোনা আওয়াজে বাঁবারে বাঁবারে করে প্রায় মাথা কাৎরাচ্ছে; লণ্ঠনের আলোয় দেখি রক্তে ভিজে গেছে জামার সামনেটা। আর ওই হারাম-জাদা বদমাসটা একেবারে পুকুরের কাদার উপর ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে—ওর বুকে বসে আছেন সুকুমারবাবু—ওঁর হাতে বসে গেছে ওই ছুরিটা। সেটা ওই বদমাসটাই বসিয়ে দিয়েছে। ওদিকে

হবে বৈরাগীর বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে সেঁটে লেগে রয়েছে, খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিতের মেয়ে সুধা। থরথর করে কাপছে ভয়ে। চেঁচিয়েছিল সুধার মা—খোঁড়া পণ্ডিতের স্ত্রী। কনেষ্টবলটা বলে,—সে থানা কম্পাউণ্ডে এই শচী ঘোষের সঙ্গে বসে একটু নেশা করছিল। বলব কি বলুন, চোলাই মদ এনেছিল শ'চে তাই খাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল দুটো মেয়েলোক—নজরবন্দী বাবুর বাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে রাস্তাটি পার হয়েই টুক করে নেমে গেল হালদার পুকুরের ঘাটে। ওরা কে—কে—বলে চ্যালেঞ্জ করে ছুটে গিয়ে ধরেছিল সুধাকে। ওরা পুকুরের জলের ধারে ধারে চলে যাচ্ছিল নিজেদের বাড়ির দিকে। সুধাকে ধরতেই ওর মা চেল্লাচেল্লি করে। ডেটেন্যু-বাবু দড়াম করে দরজা খুলে এসে কনেস্টবলকে আচমকা ঘুষি। আর এ লোকটা মানে শ'চেকে লাথি মেরে ফেলে বুকে চেপে বসেছিল। শ'চে কোন উপায় না পেয়ে ছুরি মেরেছে হাতে। সুকুমারবাবু নাকি সুধাকে আর তার মাকে ছুটে চলে যেতে বলছিল কিন্তু সুধা ভয়ে তা পারে নি। মেয়েটি আর তার মা বলে, মাঝরাতে, সুধার পেট কামড়েছিল তাই ঘাটে উঠেছিল। ঘাটে নেমেছে এমন সময় শচী আর কনেস্টবল এসে তাদের আগলায়। কনেস্টবলটা সুধাকে জাপটে ধরে। মা চীৎকার করে ওঠে। ডেটেন্যুবাবুর বাড়ীর সামনে। উনি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে প্রথমেই কনেস্টবল-টাকে নাকে মুখে ঘুষি মারেন। সে বাপ বলে ছেড়ে দিয়ে নাক-মুখ দুই হাতে ঢেকে বসে পড়ে। শ'চে ছুরি বের করে লাফ দিয়ে পড়ে সুকুমারবাবুর উপর। সুকুমারবাবু লাথি মেরে ওর বুকের ওপর চেপে বসেন। সুকুমার তো অদ্ভুত লোক। তিনি হেসে বললেন,—আর আর কি বলব? যা ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন। দুটোর একটা তো সত্যিই।

কেস হল শেষ পর্যন্ত। কেসে সুকুমার চৌধুরী আসামী। তিনি কনেস্টবলের নাক ভেঙেছেন এবং ওই শচী নামক ব্যক্তিটির বুকে

চেপে বসেছেন। সুকুমার চৌধুরী কোন কথাই বললেন না। বলা নিয়মও নয়। এসব ফৌজদারী মামলায় আসামীর নিজেকে নির্দোষ বলে মুখ বন্ধ করাই নিয়ম। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি কেস ছিল—ডিটেনশন আইন ভঙ্গ করার কেস, রাত্রে তিনি বাড়ীর বাইরে এসেছেন। সেটা পরে হবার কথা এবং সেটা বেশ মোক্ষম কেস। ওতে আর রেহাই নেই। মেয়াদ হবেই। তবে ভাগ্যক্রমে একজন কাঁচা বয়সের কচি ইংরেজ বাচ্চা সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে এসে আমাদের জেলায় এস-পি হয়ে বসেছেন এবং ইংল্যাণ্ডের সুনাম রক্ষার্থে ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হেতু, ন্যায়-সত্যকে জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন বলেই সেটাকে এখন স্থগিত রেখেছেন। সেন্ট্রাল আই-বি'র সঙ্গে চিঠি লড়ালড়ি করছেন। সেজন্য এদিকে এই কনস্টেবলের নাক-ভাঙার কেসটার তদন্ত করছিলেন নিজে। না-হলে এ কেসের ফয়সালা হতে আদৌ দেরী হত না। বলতে গেলে সুকুমার চৌধুরীর কোন ডিফেন্সই ছিল না। যার জন্যেই হোক অর্থাৎ কারণ যাই হোক—সুকুমার চৌধুরী যে কনেস্টবলের নাক ভেঙেছে—তাতে কোনই সন্দেহ নেই; সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে যে, সে তিন-চারটে ঘুষি কনেষ্টবলটার নাকে মেরেছে এবং ডাক্তার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করে লিখেছেন, এর নাকের দুটো হাড় এমনভাবে জখম হয়েছে যে এ আর মেরামত হবে না। এ ছাড়াও এর জন্য লোকটার খোনা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এক কলমেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রায় যেতে কোনই বাধা ছিল না। বাধা দিয়েছিল এই ইংরেজ তনয়টি। সে পুলিশের তরফ থেকেই সময় নিয়ে-নিয়ে চলছিল। ক্রমাগত আমাদের গ্রামে আসছিল আর যাচ্ছিল। আমার কাছেও একদিন এসে—আমার বৈঠকখানায় বসে আমাকেও জিজ্ঞাসা-বাদ করে গেল। বলে গেল দেখ—আমার একটা দারুণ সন্দেহ লাগছে। ঢাউড্রি একটা কি লুকুচ্ছে। সেটা বের হলে—কনেষ্টবলের নাক ভাঙলেও ওকে বাঁচানো যাবে বলে আমার মনে

হয় না। আমি বলেছিলাম—আমি কিন্তু কিছু জানি না সাহেব। আমাকে উনি কিছু বলেননি। আই মীন তোমাদের বলেননি এমন কোন কথা আমাকেও বলেননি উনি।

ছোকরা সাহেব বলছিল, এরা অদ্ভুত। Strange people you see.

কেসটা কিন্তু আপনা-আপনি চাপা পড়ে গেল। মাস-দুয়েকের মাথায় সুধা মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে একজন সায়া-সেমিজ ব্লাউজ-কামিজ-ফ্রক ফেরিওলা। বয়সে তরুণ। দেখতে সুশ্রী এই ফেরিওয়ালাটি মাস ছয়েক ধরেই এ অঞ্চলে এসে ঘুরছিল। লোকটি জাতিতে ভিন্ন এবং এতদিনে প্রকাশ পেল যে খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিতের বাড়ীতে একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিয়ে পণ্ডিতের স্ত্রীকে দিয়ে ফ্রক-ব্লাউজ সেলাই করিয়ে নিত।

খোঁড়া চক্রবর্তী পণ্ডিত দরিদ্র মানুষ। একখানা পা খোঁড়া গার্লস প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি করত। সে নিজেও ওই চাকরির তাগিদে সেলাই কাটাই শিখেছিল এবং সেই সেলাইয়ের কল নিয়ে কাজ করত। সন্তান-ভাগ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ; চার-চারটি মেয়ে, দুটি ছেলে এবং একটি সন্তানও তার, নষ্ট হয়নি। মেয়েরাই বড় এবং মেয়েদের মধ্যে সুধাই বড়। সুধা এল-পি'তে স্কলারশিপ পেয়েছিল। ইউ-পি দিয়েছিল প্রাইভেটে। এরপর তাকে সে প্রাইভেটে পড়িয়ে ম্যাট্রিক দেবার জন্য তালিম দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে এই ফেরিওয়ালাটি এসে জুটে সর্বাদক থেকেই উৎসাহিত করে তুলেছিল পণ্ডিতের সংসারটিকে। উৎসাহিত হননি কেবল সুধার মা এবং সুধার ঠিক পরের বোনটি।

সুধা চলে যাওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ পেয়েছিল। ঘটনাটি রীতিমত ঘোরালো। সুধার সঙ্গে ওই ফেরিওয়ালার সম্পর্কের নিগূঢ় সংবাদটি প্রথম জেনেছিল সুধার বোন। সেটির বয়স তখন বারো

বছর। সেই বলেছিল তার মাকে। মা সুধাকে সাবধান করেছিল—ফল হয়নি। তারপর শাসন করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ষোড়শী সুধা তা উপেক্ষা করেছিল এবং ফেরিওলাটি তার হাতের মুঠো শক্ত করেছিল। ফলে পণ্ডিত ক্ষিপ্ত হয়েছিল তার স্ত্রীর উপর। স্ত্রী তাকে সব বললেও তার কিছুই সে বিশ্বাস করেনি। অথবা বিশ্বাস করেও জোর করে প্রগল্‌ভ ভাবে শিক্ষার গুণগান করে অবিশ্বাস করে বলেছিল,—'তার মেয়ে সরস্বতীর উপাসিকা, সে পড়ছে। তার সম্পর্কে একথা বললে—জিহ্বা খসে যাবে।"

জিহ্বা খসার ভয়ে ঠিক চুপ করেনি সুধার মা। চুপ করেছিল। কেলেঙ্কারির ভয়ে ; কিছুটা আর্থিক সঙ্কটের ভয়ে ; কিছুটা স্বামীর ভয়ে ; কিছুটা মেয়ের ভয়ে। সুধা ক্রমশঃ এদিক দিয়ে সকল সঙ্কোচ ফেলে দেবার জন্যই উদ্যত হচ্ছিল।

এটা এই সময় চোখে পড়েছিল শচী ঘোষের। শচী ঘোষ একজন পুলিশ স্পাই, তেমন দরাজ বড়বাবু হলে তাঁর জুতোর সুখতালা সাফ শচী ঘোষ পারে না এমন কর্ম নাই। সে ঘটনাটি বলেছিল ওই কনেস্টবল দোস্তকে। মতলব ছিল এই ছিদ্রপথেই তারা সুধার জীবনে প্রবেশ করবে।

ঘটনার দিন ওই ফেরিওলা রাত্রে এসে পণ্ডিতের বাড়ীর পিছনে দাঁড়িয়ে সুধাকে সংকেত দিয়ে ডেকে—তাকে নিয়ে চলে যাবারই চেষ্টা করেছিল। আয়োজনও ছিল। রাস্তার উপয় একখানা ছইওয়ালা গাড়ীও রেখেছিল সে। কিন্তু সুধা বেরিয়ে আসতেই জেগে উঠেছিল তার ছোট বোন গীতা। সে তাকে আটকাতে চেষ্টা করেও পারেনি। অগত্যা সে ডেকে দিয়েছিল মাকে। মা দরজা খুলে বেরিয়ে গলিপথে মেয়ের অনুসরণ করে তাকে ধরতে চেষ্টা করে। সুধা তাকে ফেলে দিয়েই ছুটে যাচ্ছিল ওই ফেরিওলার পিছু পিছু। হালদার পুকুরের ঘাটে তখন ওৎ পেতে বসেছিল শচী এবং ওই কনেস্টবলটি। চোলাই মদ খেতে খেতে তারা ব্যাপারটা জানতে

পেয়েছিল।

ছুটেই বেরিয়ে আসছিল সুধা। যাকে বলে লঘু দ্রুতপদে।

কনেষ্টবলটা এগিয়ে সামনে দু-হাত মেলে দাঁড়িয়েছিল শুধু। ওদিকে কনেষ্টবলকে দেখে ফেরিওলাটা তখন অন্তর্হিত হয়েছে। এদিকে মেয়ের পিছনে পিছনে এসেছিল সুধার মা। সুধা ছোটার বেগেই এসে পড়েছিল কনেষ্টবলটার বুকের উপর। কনেষ্টবলটা তাকে বুকের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেয়নি। তখন গভীর রাত্রি এবং মেয়েটা নিজে অভিসারিকা। তাকে আস্বাদন করতে সে বিলম্ব করেনি। ক্ষুধার্ত পশুর মতই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সুধার উপর।

সুধার মা চীৎকার করে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়ে বেরিয়ে এসেছিল ডেটেন্যুবাবু। সুকুমার কি দেখেছিল আদালতে কিছুই বলেনি। থানায় বলেছিল 'সুধা' হরে বৈরাগীর বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল থরথর করে।'

মেয়ে চলে যাবার পর সুধার মা মেজ মেয়ে গীতাকে দিয়ে চিঠি লিখেছিল পুলিস-সাহেবকে। পুলিস-সাহেব এসে ওদের বাড়ীতে বসেই তাঁর এজাহার নিয়েছিলেন। শুধু সুধার মায়েরই নয় গীতার এজাহারও নিয়েছিলেন।

গীতাই বলে ফেলেছিল—কনেষ্টবলটা সুধার উপর বলপ্রয়োগ করেছিল মায়ের চোখের সামনেই—এবং গীতাই বলেছিল—মা সেই দেখেই চিৎকার করেছিল আর নজরবন্দীবাবুর সামনেও বলেছিল—আমার মেয়ের কি গতি হবে···হে ভগবান! তা নজরবন্দীবাবু বলেছিল—ভয় নাই। আমি কোন কথা প্রকাশ করব না।

সায়েব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—That's it. She tells the truth.

এর পর কেসটা তুলে নেওয়া হয়েছিল পুলিশ বিভাগ থেকে। সুকুমার এটায় খালাস পেল। কিন্তু ডিটেনশন আইনে জেল খাটতে

হয়েছিল এক মাস। সে-ও অবশ্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ডিটনশন। কিন্তু আর তাকে আমাদের এখানে পাঠানো হয়নি। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সারা বাংলা দেশেই ডিটেনশন থেকে সমস্ত বন্দীদেরই মুক্তি দিয়েছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট। তখন খোদ টেগার্টের শাসন চলছে। সুকুমারকে, সর্ব-প্রথম যাদের ছাড়া হয়েছিল তাদের সঙ্গেই ছেড়েছিল। সময়টা কখন ঠিক আজ আর মনে নেই। তবে ডিটেনশন থেকে ছাড়া পেয়েই সে একবার আমাদের গ্রামে এসেছিল। আমাদের গ্রামেই আমারই বাড়ীতে, আমারই কাছে।

সুকুমারের কিছু জিনিস গচ্ছিত ছিল আমার কাছে। সেইগুলো নিতে এসেছিল সে।

সেও কিছু কিছু লিখত। সেই লেখাগুলি আমার কাছে ছিল আর ছিল তার কিছু সোনার জিনিস। গহনা কয়েকখানা।

গহনাগুলি তার মায়ের।

তার চোদ্দ বছর বয়সে তার মা মারা গিয়েছিলেন। সেই ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র। আর ছিল দিদি। মৃত্যুর সময় তাদের দু'জনের মধ্যে গহনাগুলি ভাগ করে দিয়েছিলেন। সে কালের সিঁথি আর টিক্‌লি এবং দু'গাছি বালা। ছেলেকে দিয়ে বলেছিলেন—"তোর বাবা আবার বিয়ে করবে আমি জানি। এগুলো তোকে দিচ্ছি, তুই যেন বিক্রি করিসনে। নষ্ট করিসনে। বিয়ে করে বউমাকে দিস।" এগুলি সে কাছছাড়া করত না কখনও। এখানে আসে আমার সঙ্গে আলাপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে একদিন আমার হাতে এগুলি দিয়ে বলেছিল—এগুলি আপনাদের বাড়ীর জিনিসপত্রের সঙ্গে রেখে দেবেন। আমার রাজবন্দীর নড়বড়ে দরজা—ভাঙা খিল দুর্গ বা শালা যাই বলুন—এর মধ্যে সব সময় খুব নিরাপদ নয়। আমি তো দু'বেলা বেড়াতে বের হই। বাড়ীটা খালি পড়ে থাকে। এ পাড়ার ক'টা ছেলে দেখেছি আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধান

পেলে—কে জানে—।

একটু হেসে নিয়ে বলেছিল—ওদের বয়সে আমাদের মনে পড়ে দুপুরে লোকের বাড়ী ঢুকে আমরা আম-পেয়ারা চুরি করেছি, আমসত্ত্ব রোদ্দুর দিলে চুরি করেছি—আচারও। আমাদের গাঁয়ে যাত্রার দল ছিল—আমাদেরই জ্ঞাতির ঘরে সাজপোশাক থাকত। পরচুলো পরে বসে থাকতাম। আর কাচের মালা চুরি করতাম। মায়ের জিনিস আমার। আমার বউকে দেব। অবিশ্যি বিয়ে হবে কিনা ভগবান জানেন।

আমি রেখে দিয়েছিলাম। সেই গচ্ছিত গহনাগুলি নিতে এসে ছিল। আমি নিজেও বিব্রত ছিলাম, মামলাটায় যবনিকাপাত হল, ডিটেনশন আইনে জেল হল এক মাস—তারপর জেলের মেয়াদ শেষ হতেই জেল থেকেই সুকুমারকে পাঠিয়েছিল বাঁকুড়াতে। আমি আর দায়মুক্ত হতে পারিনি। এসেছিল মাস আষ্টেক পরে তো বটেই। তখন খোঁড়া চক্রবর্তীদের বাড়ীতে বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। সুধা চলে গেছে ফেরিওলার সঙ্গে তার ফলে লোকে বা সমাজে ঘোষণা করে তাকে পতিত কেউ ঠিক করেনি—তবে কাজকর্মে তাই এরকম দাঁড়িয়েছে। নেমতন্ন-টেমন্তন্নের ক্ষেত্রে খোঁড়া চক্রবর্তী গ্রামের বাসিন্দা নয় বলে সচরাচর কর্মে তাঁর নেমতন্ন হত না। বড় বড় কর্মে হত। চক্রবর্তী ছেলেমেয়েকটাকে নিয়ে খান দুই তিন থালা নিয়ে অবশিষ্ট তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা এবং দুই পুত্রকে নিয়ে হাজির হত এবং সাধারণ ব্রাহ্মণদের পংক্তির সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটি স্বতন্ত্র স্থান বেছে নিয়ে খেতে বসত। দু-চারজন বা পাঁচ-সাতজনে দশ বিশটা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করত। কিন্তু খোঁড়া চক্রবর্তীর গায়ের চামড়া তখন এতই পুরু হয়েছে যে তাকে বিদ্ধ করতে না পেরে ভোঁতা হয়ে পড়ে যেত।

এই সময় সুকুমার চৌধুরী এখানে ফিরে এল—আমার কাছে গচ্ছিত জিনিসগুলি নেবার জন্য। তখন সে ডেটেনু নয়। আমার

বাড়ীতেই উঠেছিল। দিন দু'য়েক থেকেই চলে যাবার কথা। সুকুমার বিচিত্র সুকুমার—। বাংলাভাষায় একটা কথা আছে—ছেলের ছাগল বুড়োর পাগল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানে ঠিক হয় না। তবে এই যদি সত্যি হয় যে ছেলেরা ছাগল ভালবাসে এবং বুড়োরা পাগল ভালবাসে তাহলে কথাটার মানে হতে পারে। কারণ ওইটেই ওর অর্থ। ছেলে এবং বুড়ো এই দুই বয়সের মানুষের কাছে সমান প্রিয় সচরাচর এ হয় না। সুকুমারের পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ কাজ ছিল। বুড়োদের আসরে বসে বৈদ্যসন্তানটি কারও নাড়ী ধরে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকত দু' মিনিট। তারপর বলত—ডাক্তার যা বলছে বলুক—যে ওষুধ দিচ্ছে খান—কিন্তু সিদ্ধ মকরধ্বজ একমাত্রা করে খাবেন। আর ঋতু-হরিতকী খাবেন শোবার সময় এবং মাছটাছগুলো আর খাবেন না। বার্ধক্য হল দ্বিতীয় শৈশব। দাঁত উঠলে যেমন দুধ ছেড়ে ভাত দেয় ছেলেকে, চিবুবার সামগ্রী দেয় খেতে, তেমনি দাঁত পড়ে গেলে শক্ত জিনিস ছেড়ে আবার দুধ-ভাতুতে আসতে হয়।

সমাজ নিয়ে তর্ক করত। ওই সুধার কথা নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে গাল দিত বৃদ্ধদের।—আপনারা আর মুখ দেখাবেন না। বড়াই করে বড় বড় কথা বলবেন না। এমনি একটা মেয়ে—দেখতে মেয়েটা ভাল ছিল, লেখাপড়া করছিল। সেই মেয়ের পাত্র জুটল না। আপনাদের হিঁদুর ছেলেরা প্রেম করবে—দেহ ভোগ করে সরে পড়বে। বেশ করেছে সে—চলে গেছে অন্য জাতের সঙ্গে। সে ওকে বিয়ে করে ঘরে নেবে। এ-সমাজ আপনাদের থাকবে ভেবেছেন ?

আবার ছেলেদের সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়ে জুটল দু-তিনদিন। এই ক'দিনে নজরবন্দী সুকুমারকে যতটুকু দেখতে পাইনি সেটুকুও দেখে সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাড়ী বাড়ী গেল দেখা করতে।

খোঁড়া চক্রবর্তী এল। তাকে সুকুমার পাঁচটা টাকা দিলে। বললে আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন।

চক্রবর্তী-স্ত্রী এসেছিল গীতাকে সঙ্গে নিয়ে। গীতা তখন তের পার হচ্ছে-হচ্ছে। রোগা দেখতে মাথায় লম্বা পিঙ্গলবর্ণা চুল গুলিতেও পিঙ্গলাভা, গীতা একটু বেশি লম্বা বলেই কোলকুঁজো হয়ে নুইয়ে পড়েছে। ১৯২৮ সাল তখন। আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তখনও সায়া-ব্লাউজ ওঠেনি। সম্পন্ন ঘরের বউয়েরা সাধারণতঃ সেমিজ পরত, নেমন্তন্ন বাড়ী যেতে হলে সেমিজের উপর বডিজ পরত। পাতা কেটে চুল বাঁধার যুগ। তাও বিকেলবেলা। সাধারণ ঘরে শুধু একখানা কাপড়ই ছিল মেয়েদের সব অর্থাৎ বেশও বটে, বাসও বটে। ভূষার মধ্যে শাঁখা রুলি। বড়ঘরের কথা ছেড়ে দিচ্ছি তখন বেশে যতই থাক্‌তি থাক, সোনার গয়নার তখন রেওয়াজ যথেষ্ট। একহাত সোনার চুড়ি থেকে নাকে কানে হীরে এবং রুলি পর্যন্ত। গীতার পরনের বস্ত্রখানি শুধু মলিনই ছিল না কিছু ছেঁড়া ছিল। সেলাই-গুলি প্রকট হয়েছিল মেয়েটা সদ্য-উদ্ভিন্ন যৌবনের সঙ্কোচে কুঁজো হয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করেছিল।

সুকুমার ওকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—এ যে মস্ত বড় হয়ে উঠেছে আরে বাপরে!

পণ্ডিতের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর থেকে বলেছিল—ওর ভাবনাই তো ভাবনা আমার এখন। একটি ভাল ছেলেটেলে দেখে যদি আপনি ওর ব্যবস্থা করে দেন বাবা—

সুকুমার বলেছিল—দেখব, আমি নিশ্চয়ই দেখব। তবে মেয়েরা শুধু বিয়ের জন্যে—এটা ঠিক নয়। মেয়েরাও পুরুষদের সমান কাজ করতে পারে।

একটা দীর্ঘ বক্তৃতা সে দিয়েছিল।

অবশেষে ওদের জন্যে ব্যবসা পত্তন করে দিয়ে গিয়েছিল। আগেও বলেছি আবারও বলছি সুকুমার আশ্চর্য। অনায়াসে একটি সহজ ব্যবসা ওদের জন্য পত্তন করে দিলে; মুখে মুখে লাভ-ক্ষতি খতিয়ে নিশ্চিত লাভ দেখিয়ে দিলে।

পৈতের ব্যবসা, ধূপকাঠির ব্যবসা আর চরকার সুতো কাটার কাজ জুড়ে দিলে তার সঙ্গে। বেশি নয়—বোধ করি শ'-দেড়েক টাকা সে একটা দোকানে দিয়ে বলে গেল—ধারে মাল দেবে, সে-ধার শোধ করলে আবার দেবে। অর্থাৎ মূলধনটা ভাঙবে না। আর খোঁড়া পণ্ডিতের জন্যে গ্রামের লাইব্রেরীতে বলে কয়ে সাত টাকা মাইনের কেরানীর কাজ জুটিয়ে দিলে।

তারপর একদিন সুকু বদ্যি চলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে পৈতে এবং ধূপকাঠি কেনার জন্যে দুটো মেয়ে আর দুটো ছেলের তাগাদায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা খুব বেশিদিন স্থায়ী হল না। কারণ ওদের মূলধন দেড়শো টাকা—ওই পাঁচটা ছেলেমেয়ে এবং চক্রবর্তী স্বামী-স্ত্রীর কাছে কতদিন অটুট থাকতে পারে।

ইতিমধ্যেই কানে আসতে লাগল—খোঁড়া চক্রবর্তীর বাড়ীর সামনে এবং আশপাশটা কিছুটা চঞ্চল হয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

পল্লীগ্রামের পথ বা ঘাটের পাশে যে জঙ্গলগুলি থাকে মধ্যে মধ্যে সেইগুলির আশেপাশে মৌমাছি-ঝাঁক উড়তে দেখা যায় এবং তখনই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় জঙ্গলটার দিকে এবং বাতাসের মধ্যে নাকও সচেতন হয়ে ওঠে। বোঝা যায় ফুল ফুটেছে।

একদিন চক্রবর্তীর স্ত্রী গীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এল। গ্রামের একটি অতি অভদ্র ব্রাহ্মণ-তনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। ছেলেটি মদ্যপ, ব্যাভিচারী, বিবাহিতও বটে—তার দাবি গীতার দিদি সুধা যখন ভিন্নজাতের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তখন সে স্বজাতি ব্রাহ্মণ এবং এ গ্রামের প্রাচীন বংশের ছেলে, তাঁর সঙ্গে গীতা লতার মত জড়িয়েই বা থাকবে না কেন? কোন্ শালাকে কি ভয়?

আমাকে বললে চক্রবর্তীর স্ত্রী—এর কি কোন উপায় হবে না বাবা? ওদিকে ওর বাবা কোথায় কোথায় যেন কি করছে—কার সঙ্গে গীতার বিয়ের কথা বলছে—বিয়ে না ছাই বাবা। মেয়েটাকে

বিক্রি করবে শুনেছি।

আমি তাকিয়েছিলাম গীতার দিকে। আরও ছ'মাস চলে গেছে এর মধ্যে। শত অভাব-অনটনের মধ্যেও গীতার রূপ হয়েছে বসন্তের মাধবীলতার মত। মাধবীর কচিপাতার যে চিকনতা রৌদ্রের ছটায় ঝিকমিক করে তেমনিই একটি ঝিকমিক যেন ওর সেই পিঙ্গলবর্ণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিঙ্গলবর্ণটা কোন যাদুতে ওই চিকনতা নিয়ে মাখন বর্ণের মত বর্ণও কোমল আভাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে তার রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হয়েছে। চোখের পাতাদুটো এত ভারী হয়েছে যে, সে আর চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সময় দেহখানায় একটি পুষ্টি যেন সে বাতাসে আর আলো থেকে পাচ্ছে। হাতের বাহু দুটো নিটোল হয়ে উঠেছিল।

বললাম—ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?

চক্রবর্তীর স্ত্রী বললে—কার কাছে রেখে আসব বাবা? ছেলে দুটো বাউণ্ডুলে হয়েছে। কি করব, বিড়ি বাঁধতে দিয়েছে—বিড়ি বাঁধে। তাদের ছোট মেয়ে দুটোর একটা হাবলি। একে রেখে আসব কার কাছে? ও একটা ছুরি নিয়ে রাখে চব্বিশ ঘণ্টা। আর ভারী ঝগড়াটে—কোথা কি হবে? তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

চমকে উঠলাম। বললাম—তুমি ছুরি রাখ কাছে?

গীতা মুখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ নিয়ে অকারণে পাকা মেঝে খুঁড়তে চেষ্টা করছিল। সে তেমনি ভাবেই বললে—হ্যাঁ।

বললাম—দেখি।

দেখালে সে। সেটা এমন ছোরাছুরি কিছু নয়, নেহাতই কাঠের বাঁট লাগানো দেশী কামারের গড়া আঙুল তিনেক লম্বা একটুখানি একটা ছুরি। অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি লম্বা। আগে এই ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটা হত। কলম কাটা হত। পণ্ডিতরা রাখত, জমিদারি সেরেস্তায় থাকত। আমি চিনতাম।

বললাম—বলে দেব আমি।

* * *

বিচিত্রভাবে কালের গুণে গীতার ভাগ্য পাল্টালো। গীতা পাল্টালো, গোটা গাঁয়ের লোক বিস্মিত হয়ে গেল।

১৯২৯ সালের পুজোর পর; ১৯৩০ সালের আগমনী তখন বাজতে শুরু করছে। একটা ঋতুর অন্তে আর একটা ঋতু আসবার সন্ধিক্ষণে তার প্রভাব যেমন আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করি তেমনি করেই ব্যাপারটা অনুভব করছি। এমনি দিনে একদা সুকুমার বদ্যি এসে হাজির হল। এল, উঠল আমারই বাড়ীতে। বললে—এখানে কবিরাজী করব। বদ্যির ছেলে—ডাক্তারী পড়েছি পাঁচ বছর, ভেবেছিলাম—ডাক্তারীটা পাশ করব, কিন্তু নাঃ—সে থাক। ঠিক করেছি কবিরাজী করব এবং এইখানেই করব।

মনে পড়ছে আমি এবং সে দুজনে গোটা গ্রাম ঘুরে সকলকে কথাটা বলে এসেছিলাম।

বাজারে একখানা কোঠাবাড়ী ভাড়া নিয়ে সুকুমার বদ্যি ওষুধের আলমারী, তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার, কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে পড়ল। খোঁড়া চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে খান-চারেক বাড়ীর পর একখানা কোঠাবাড়ী, পাকা মেঝে চুনকাম করা দেওয়াল; সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিলে—"ভারত আয়ুর্বেদ ভবন"।

তার ঠিক পাশে না হলেও বাড়ীটার আর একটা ঘরের দরজার মাথায় আরেকটা বোর্ড ঝুলল—তার নাম হল—"স্বদেশী ভাণ্ডার"। খদ্দর, শাড়ী, ধুতি, জামার কাপড়, তৈরী জামা, দেশী কালী, পেন্সিল পাওয়া যায়।

আমাকে সুকুমার বললে—মুভমেণ্ট আসছে। এটাকে তার সেণ্টার করুন। লেগে পড়ুন আমার সঙ্গে বা আমিই এসেছি আপনাদের সঙ্গে লাগতে।

সুকুমারের কম্পাউণ্ডার হল খোঁড়া চক্রবর্তীর বড় ছেলেটা, গীতার

ছোট সেটা। তখন তার বয়স বছর-তের হবে। সঙ্গে রইল খোঁড়া নিজে। আর সুকুমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলে চক্রবর্তীর বাড়িতে। দিনে সুকুমার এসে খেয়ে যেত। রাত্রে ওই ছেলেটা টিফিন-কেরিয়ারে করে পেঁছে দিয়ে আসত। কিছুদিন পর দেখা গেল—ওই স্বদেশী ভাণ্ডারে—গীতা বসেছে সেলস্‌গার্ল হয়ে। শুধু সেলস্‌গার্ল নয় দেখতে দেখতে প্রচারিকা হয়ে উঠল সে। গোটা গ্রামটায় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চক্রবর্তী-গৃহিণী তার জন্য আর শঙ্কিত হলেন না।

সকল শঙ্কা কাটিয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াতে লাগল মেয়েটা নির্ভয়ে।

১৯৩৯ সাল এল।

সুকুমার জেলে গেল। আমিও গেলাম, আরও অনেকে গেল। ১৯৩০ সালের কথা যাঁদের বিশেষ করে মনে আছে তাঁরা মনে করতে পারবেন—আমাদের জেলায় অন্তত মেয়েরা জেলে যায়নি। পুলিশ বিভাগও এদিক দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে। তারা মেয়েদের এ্যারেষ্ট করেনি। গীতা জেলে যায়নি। তবে যতজন জেলে গিয়েছে তাদের ফুলের মালা পরিয়ে সারা গ্রামের মেয়েদের বিভাগের মিছিলের আগে থেকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে। যেদিন একসাইজ শপে পিকেটিংয়ের জন্য ছেলেদের ধরে এনে বেত মারল, সেদিন দলবল নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল থানায় প্রতিবাদ জানাতে।

মুভমেণ্ট ঠাণ্ডা হল। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোসের কথা হতে লাগল। গান্ধী-ডারউইন চুক্তি। সকলে খালাস পেলে। গীতা স্বদেশী ভাণ্ডার চালাচ্ছিল। স্বদেশী ভাণ্ডার সার্চ হল ক'বার, কিন্তু হল না কিছু। তাতেও ভাণ্ডারের ক্ষতি হল না। ভাণ্ডার ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত জেঁকে উঠল। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে চালিয়েছিল গীতা। সুকুমার জেল থেকে খালাস পেয়ে এখানেই এল। তখন সে খুব অসুস্থ। কিছুদিন থেকে সে সারল। তারপর

আমাকে বললে—আমাকে কিছু জমি দিন। টাকা আমি দেব। বাগান করব, পোলট্রি করব—চাষ করব।

জমি আমি তাকে দিয়েছিলাম। লোকটা পারঙ্গম—সে বীরভুমের লাল কাঁকর পাথর-ভরা মাটিতে গোলাপ ফুল ফুটিয়েছিল। চক্রবর্তীর গোটা পরিবারটা তার সঙ্গে খেটেছিল। তারপর সুকুমার একদিন চলে গেল। শেষের দিকটায় যাচ্ছিল আসছিল, ক্রমে বেশি বেশি দিন বাইরে থাকছিল। তারপর একদিন আসা বন্ধ করলে।

খোঁড়া চক্রবর্তী মরল। ছেলে দুটোর বড়টা একটা ব্রাত্য মেয়েকে নিয়ে পালাল। ছোট মেয়ে দুটোর মধ্যে বড়টা—যেটা ছিল হাবলি, সেটা মরেছে অপঘাতে। হত্যা বলা চলে। গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিছল। চারদিন পর খবর পাওয়া গিছল মেয়েটা জঙ্গলের ভিতর মরে পড়ে আছে। তার পাশে একটা মৃত ভ্রূণ। একেবারে ছোটবোনটা মরল কি একটা রোগে। সামান্য অসুখ। অনাহারে জীর্ণ এবং তার উপর অমিতচারে অপব্যয়িত দেহখানা ফাটা কাঁচের বাসনের মত অল্প গরম জল পড়তেই দু'খানা হয়ে গেল। বাকি রইল একটা ভাই সে বিড়ি বাঁধত। তার মা ভিক্ষে করত। একলা গীতা কেবল এরই মধ্যে কোনরকমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে প্রাইমারী ইস্কুলের সব থেকে ছোট মাষ্টারনী হয়েছিল। মেয়েটি ছিল সুন্দরী। সে সৌন্দর্যরূপের একটি মহিমা পেয়েছিল একেবারে প্রথম যৌবনে। সেটি দিনে দিনে রূপ এবং মর্যাদার মহিমায় গরিমাময়ী হয়ে উঠেছিল ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত। সে হাতে সেলাই খদ্দরের ব্লাউজ সায়া-শাড়ী পরে বইয়ের গোছা নিয়ে প্রাইমারী ইস্কুলে যেত, কোনদিকে তাকাতো না। তার যৌবন এবং স্বাস্থ্য—এই দুটিই যেন একটি অজ্ঞাত উৎস থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে অটুট ছিল।

অনেক লোকে অশ্লীল মন্তব্য করত।

তাকে বিয়ে করবার জন্য গ্রামের জনকয়েক ছেলেই প্রায় পাগল-

গোছের হয়েছিল। চিঠি লিখেছে—আত্মীয়দের পাঠিয়েচে। আত্মীয়রা সঙ্গে করে নিজেরা এসেছে। এর মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে ছিল—চাকুরে ছিল। দু-তিনজন মাষ্টারমশাইও ছিলেন। কিন্তু গীতার সেই এক কথা—না।

বেশি জোর করলে বলেছে—বিয়ে আমি করব না। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

* * *

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট অকস্মাৎ সুকুমার চৌধুরী এসেছিল আমাদের গ্রামে। আমাদের গ্রামের স্বাধীনতা উৎসব একেবারে অমিত উৎসাহে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সুকুমার একদা আসেনি। সস্ত্রীক এসেছিল। একদিন থেকেই চলে গিয়েছিল। সুকুমার পতাকা তোলার সম্মান দিয়েছিল গীতাকে। ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যেবেলা সুকুমার চলে গেল। রাত্রে কপালে একটা আঘাত পেয়েছিল সে। ভুরুর উপরটা কেটে গিছল। সেইটের জন্যে মুখটা খানিকটা ফুলেছিল এবং যন্ত্রণা হচ্ছিল বলেই চলে গিছল। আমরা আটকাইনি।

এরপর ১৯৪৮ সালে সুকুমার আর একবার এল। এবার সে একা। তার স্ত্রী নেই—সে মারা গেছে।

বলে ছল—আবার থাকব বলে এলাম। কবিরাজী করব। পোলট্রি ফার্মিং বাগান। আর নড়ব না কোথাও এবং ষ্টীক্‌টলি ব্যবসাদার মানুষ হব। পৃথিবীতে মানুষের উপকার বা মানুষের সেবা করতে কোনদিন চেষ্টা করব না। গীতাকে একটা খবর দেবেন। আমি এসেছি।

গীতা তখন আর এক গীতা।

পুরনো গীতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কথায় বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রঃ।—নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়ই বটে। কিন্তু তা দিয়েও গীতার চরিত্রের বিস্ময়কর বৈচিত্রের কোন হদিসই মেলে না। ১৯২৭ সালে

যে মেয়ের বয়স ছিল বারো, ১৯৪২-৪৩ সালে যার বয়স ছিল আটাশ-উনত্রিশ এবং সেই আটাশ-উনত্রিশ বৎসর বয়সে যার রূপ এবং যৌবন একটি দুর্লভ সুষমা এবং আকর্ষণীয়তায় মনোরমা ও লোভনীয়া ছিল—যার মন ভালঘরের ছেলে, শিক্ষিত পুরুষ, মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের প্রার্থনায় টলে নাই, সেই মেয়েটির যে কি হল কে জানে, হঠাৎ ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুর ক'দিন আগে বিয়ে করে বসল ওদের স্কুলের প্রবীণ পণ্ডিতমশাইকে। বছর পঞ্চাশের উপরেই বয়স—সম্প্রতি বিপত্নীক হয়েছেন—সন্তান-টন্তান নেই; বাড়ী আমাদের ঠিক পাশের গ্রামে এবং এই কয়েক মাসে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ মাসের মধ্যে মেয়েটা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ আলাদা এক মেয়ে। কোথায় গেল তার মাস্টারণীর ছাপ, কোথায় গেল সভা-সমিতিতে অংশ নেওয়া, কোথায় গেল তার সেই পরিচ্ছন্নতা, সে হয়ে উঠল আর পাঁচটা গাঁয়ের বউবেচারীর মত একটি বউবেটী। কথাটা মিথ্যে বলিনি—সে বেটীও বটে, বউও বটে। আমাদের পাড়ার বেটী—তার ওপাশে যে বসতিটা খানকয়েক ধানজমির পরই—সেটা নামে অন্য গ্রাম হলেও, সেটা এই গ্রামেরই পাড়া হিসাবে গণিত হয়। শুধু তাই নয়, দেখতে দেখতে মেয়েটির মুখে যে একটি প্রসাধনের শ্রী ছিল, সেটা মুছে গেল। বেশ একটু শীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু শীর্ণ হলেও, প্রসাধনের মার্জনার শ্রী না থাকলেও, আর একটি অনির্বচনীয় শ্রী তার মুখে-চোখে-সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল। অনেকের এটা চোখে ধরত না। একালের চোখ যাদের, তারা তেলচক্‌চকে মুখ, মোটা করে সিঁদুরের মাড়ুলী-আঁকা কপাল, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরার বদলে পুরনো-কালের ঢলকো করে কাপড় পরা—তাকে তাদের ভাল লাগত না।

আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—গীতা, তুই বিয়ে করলি তো—বাকিটা বলতে পারিনি।

সে বলেছিল—শঙ্করদা, জন্ম-মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।

তা যদি না মানেন তো বলি বুড়োকে দেখে সত্যি মায়া হল—আর ওই লোকটি আমাকে যে কি ভালবাসাই বাসত। আমি হেঁটে গেলে ও বুক পেতে দিতে পারত। ছেলেপুলে নেই। যেদিন বউ মরে গেল সেদিন ওর কি কান্না। ছোট ছেলের মা মরলেও ছেলে এত কাঁদে না!

যাক। কথা সুকুমারকে নিয়ে, গীতাকে নিয়ে নয়।

১৯৪৮ সালের সেটা পুজোর মাস। সুকুমার এল। তার স্ত্রী মারা গেছে। এবার সে স্থির করেছে এখানে এসে বাকি দিনগুলো এখানকার দীন-দুঃখীদের চিকিৎসায় সেবা করবে—আর ওই জমিতে ফার্মিং পোলট্রি ইত্যাদি করবে। বললে—গীতাকে একটু খবর দেন। তার সাহায্য আমার দরকার হবে।

আমি বললাম গীতার কথা। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—বিয়ে করেছে? বুড়ো পণ্ডিতকে?

—হ্যাঁ।

—তবু একটা খবর দিন। বলবেন, যাব তার বাড়ি সন্ধ্যেবেলা।

লোকটা ফিরে এল, সঙ্গে এল বুড়ো পণ্ডিত, পণ্ডিত নমস্কার করে শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সুকুমারকে বললে আপনাদের দু'জনকে আমাদের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ওর বড় ইচ্ছে।

রাত্রে খেতে বসে আয়োজন দেখে অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম। তার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেটা সেদিন কোন অর্থই বহন করেনি আমার কাছে, আজ তার একটা অন্য অর্থ পাচ্ছি। সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ওঃ ভুরুর কাটা দাগটা তো অনেকটা হয়ে থেকে গেছে। সেদিন তাহলে অনেকটা কেটেছিল।

তারপর নমস্কার করে বলেছিলো এখন দীক্ষা নিয়েছি। বামুনের মেয়ে—বামনের বউ। আজকার বিদ্য আপনি—আপনাকে দাদা বলে থাকি, তা বলে প্রণাম করতে পারবো না—বসুন। একেবারে জায়গা করা ছিল। সেখানে বসিয়ে খাবারের থালা দু'খানা সামনে ধরে দিয়ে পাখা হাতে বসেছিল।

জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল—নানান খবর। সুকুমারের মৃতা স্ত্রীর খবরই বেশি। ওর সঙ্গে বিয়ে হল কি করে। প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন? না বাড়ীর গার্জেনরা দিয়েছিল—এই ধরনের অনেক প্রশ্ন।

www.boiRboi.blogspot.com

সুকুমার এ প্রশ্নে ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল। যাবারই কথা। আমি ইশারা করে গীতাকে বারণ করেছিলাম—এ সব জিজ্ঞাসা করো না। কিন্তু ঠিক শোনেনি সে।

খেয়ে আঁচিয়ে উঠলাম—পণ্ডিত আমাদের একখানি নতুন তোয়ালে দিল মুখ মুছতে। সবিনয়ে বললে—নতুন, ব্যবহার করা নয়।

পান নিয়ে এসে দাঁড়াল গীতা। পান দিয়ে বলল—আপনি এখানে নাকি আবার প্র্যাক্‌টিস করবেন বলে এসেছেন—সুকুমারদা?

সুকুমার বলেছিল—ভাবছি।

'না'। একটা এমন কঠিন 'না' শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল ওই মেয়েটির কণ্ঠ থেকে যে, আমরা দু'জনেই চমকে না উঠে চকিত হয়েছিলাম এবং বিস্মিতও হয়েছিলাম। সে 'না' যেন অলঙ্ঘনায় 'না'।

* * *

সুকুমার চলে গিয়েছিল সেদিন। তারপর তার আর কোন সন্ধান পাইনি। দীর্ঘ এত বৎসর পর—এটা ১৯৬০ সাল—১৯৪৮ সালের বারো বৎসর পর হঠাৎ এই রেজেস্ট্রী প্যাকেটটা এল। জানতে পারলাম সুকুমার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল—নাম নিয়েছিল সেবানন্দ ব্রহ্মচারী। উত্তরপ্রদেশের এক কৃশ্চান মিশন হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে এই দলিল রেজেস্ট্রী করে আমার কাছে পাঠিয়েছে। ওই যে পাঁচ বিঘে জমি এবং ওই যে বাড়ীটা সে কিনেছিল সে সবই সে দান করে গেছে গীতাকে। পড়ে চোখে জল এসেছিল।

দানপত্রখানা হাতে করে গেলাম গীতার বাড়ী। গীতা বিধবা

হয়েছে। গীতা আজও যুবতী। বিধবা হয়ে এই পরিণত যৌবনে ৪৪ বসংর বয়সে তার রূপ যেন আরও বেড়েছে। দু'একগাছি রূপোলী রেখাও তার মাথায় দেখা যায় না। মুখে এখনও রেখা পড়েনি। দেহে মেদ হয়নি। ফিতেপাড় কাপড়ে এবং সরু বর্ডার দেওয়া হাতা-ব্লাউজে খুব চমৎকার দেখায় তাকে। তার কাছে গিয়ে বললাম—দুঃসংবাদ আছে গীতা।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে—সুকুমারবাবু মারা গেছেন?

—তুমি কেমন করে জানলে?

—একখানা চিঠি পেয়েছিলাম—তাঁর অসুখ করেছে।

—হ্যাঁ। সে আর নেই।

—দানপত্র পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—আমি পাঠাতে বারণ করেছিলাম। অনুমান করেছিলাম হয়তো আপনার নামে পাঠাবে। ভেবেছিলাম বারণ করব আপনাকে —রেজেষ্ট্রী এলে নেবেন না। কিন্তু ভাল লাগেনি।

একটু চুপ করে থেকে বললে—লোকটিকে প্রথম মনে হয়েছিল দেবতা। তারপর মনে হয়েছিল—ভগবান বুঝি ওকে আমার জন্যেই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। গত জন্মে তপস্যা করেছিলাম কোন সাধু তপস্বীকে জীবনে পাবার জন্য—তাই এ জন্মে আমাকে করেছে গরীবের মেয়ে আর ওকে করেছে—দেশের সেবক। কিন্তু—

বলে উঠলাম—কিন্তু মানে?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গীতা। তার হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সে এক টুকরো সাদা-জমি কাপড়ের উপর সুচসুতো দিয়ে কাজ করছিল। মনে হল যেন, অনেক কথা মনে পড়ে গেছে তার। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এর আগে সে আমাকে লিখেছিল, তার জমিটি আমাকে দিতে চায়। আমি তাকে বারণ করেছিলাম।

বলেই চুপ করলে সে।

আবার একটু পর বললে—তখনই মনে হয়েছিল যে, হয়তো বা আপনার হাত দিয়ে ঘুরে-পথে পাঠাবে। আপনি নেবেন—দানপত্রখানা—তারপর আমাকে বলবেন নাও। আমায় না নিয়ে উপায় থাকবে না। মনে করেছিলাম আপনাকে বারণ করব। বলব, ওর কাছ থেকে কোন রেজেষ্ট্রী-টেজেস্টী এলে আপনি যেন নেবেন না। কিন্তু—।

আবার ও একটু চুপ করে থেকে বললে—তাও পারিনি। কেমন যেন মনে মনে সঙ্কোচ হয়েছিল।

আমিও একটু ইতস্ততঃ করে ভেবে নিয়ে তাকে বললাম—কিন্তু তুমি নেবে না কেন? সে লোকটি তোমাদের জন্যে বিশেষ করে তোমার জন্যে তো কম করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে গীতা উত্তর দিলে—অনেক অনেক করেছে শঙ্করদা। কিন্তু—

* * *

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল গীতার। অত্যন্ত অকস্মাৎ। যেন হঠাৎ তার আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—বসুন। আমার কথাগুলো শুনুন। আপনি বললেন—সে আমাদের জন্যে—আমার জন্যে কম করেনি, অনেক করেছে। কিন্তু আমিও কি কম করেছি তার জন্যে?

আমি বললাম—সে সব তো জানি গীতা। আমার কাছে সেও কিছু গোপন করত না, তুমিও না।

গীতা একটু হাসলে। সে এক বিচিত্র জাতের হাসি এবং সে হাসি বুঝি মেয়েরাই শুধু হাসতে পারে। হাসিটুকুর রেশ ঠোঁটের ডগায় মেখেই সে বললে—না, শঙ্করদা, সে আপনি জানেন না। আমি তো কখনও বলিইনি—সেও বোধ হয় বলেনি।

হেসে আমি বললাম—কি কথা? তুমি তাকে ভালবেসেছিলে?

গীতাও হেসে জবাব দিলে—ও তো সবাই জানে। কথাটা নিয়ে

তো এককালে রটনা কম হয়নি! দেওয়ালে দেওয়ালে—খড়ি দিয়ে, কয়লা দিয়ে,—। থেমে গেল বলতে বলতে ;—থেমে ভাল করে হেসে বললে—তখনও দেওয়ালে দেওয়ালে আল্‌কাতরা কি রঙ দিয়ে—শ্লোগান লেখার রেওয়াজ ওঠেনি—নইলে হয়তো ফুটখানেক লম্বা হরফে আজও সে লেখা দেখা যেতো—"সুকু বদ্যির গীতার গুণ—চত্রি মাসের নিম বেগুন"।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—এককালে,—এককালে কেন—সময়টা ১৯৩৯ সাল ; তিরিশ সালের আন্দোলনের ঠিক আগেই যখন সুকুমার ফিরে এসেছিল আমাদের এখানে এবং বাজারে একটা গোটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে কবিরাজী করতে বলেছিল যখন গীতার ঠিক পরের ভাইটা হয়েছিল তার কম্পাউণ্ডার যখন গীতা হয়েছিল সুকুমারের স্বদেশী ভাণ্ডারের পরিচালিকা, যখন গীতাদের বাড়ী থেকেই টিফিন-কেরিয়ারে করে সুকুমারের খাবার আসত এবং যে অজুহাতে সুকুমারই এরকম চক্রবর্তী বাড়ীর হাটবাজারের সব খরচটাই চালাতো তখন। একদিন সকালে সকলে দেখলে চক্রবর্তীদের বাড়ীর দরজার আল্‌কাতরা মাখানো গায়ের উপর কেউ খড়ি দিয়ে লিখে দিয়েছে ওই ছড়াটা। "সুকুবদ্যির গীতার গুণ—চত্রি মাসের নিম বেগুন"। ক'দিন পর সুকুমারের বাসার দরজাতেও কেউ লিখে দিয়েছিল ওই ধরনেরই একটা কথা। "সুকু বদ্যি কচি গীতা"। এমনি ধরনের অনেক রটনা তখন লেখা হয়েছিল—গ্রামের এখানে-সেখানে।

ব্যাপারটা বেশি দিন চলেনি। ১৯৩০ আসতে-আসতে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত সব লেখা মুছে গিয়েছিল। দেশটাই যেন বদলে গিয়েছিল। কথাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে মনে রয়েছে। ১৯৩০-এর কল্যাণে ও কথাগুলো ভুলবারই নয়। কারণ সুকুমারই সে-সময়ে আমাদের গ্রামের নায়ক হয়ে উঠেছিল।

গীতা বললে—ওই যে ছড়াটা—"গীতার গুণ নিম বেগুন" ওটা কিন্তু আমার তৈরি আর আমিই ওটা লিখেছিলাম শঙ্করদা। এ

কথাটা কি জানতেন ?

চমকে উঠলাম—তার মুখের দিকে চাইলাম বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

আমার দৃষ্টির বিস্ময় দেখে মুখ নামাল গীতা ; সম্ভবতঃ লজ্জা পেলে। পরক্ষণেই মুখ তুলে বললে—আপনার মত আমিও মধ্যে মধ্যে ভাবি শঙ্করদা, কি করে আমি পেরেছিলাম এ কাজ করতে। আগেও অনেকবার ভেবেছিলাম—আজও ভাবছি। ঘটনাটা আমার জ্বলজ্বলে হয়ে মনে রয়েছে।

একটু থামলে এরপর গীতা। তারপর বললে—কিছুটা আগে থেকে বলি শঙ্করদা। ওই লেখার বছর দেড়েক আগে—আপনার মনে আছে আমার যখন তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স তখন সেই যে সুকুমার-বাবু এলেন বোধহয় সেই দ্বিতীয়বার, দিদির কান্ডের পর আর কি—খালাস হয়ে এলেন, কয়েকদিন থেকেই চলে গিছলেন সেবার। সেবার আমাকে দেখেই প্রথম বলেছিলেন—আরে, এ যে মস্ত বড় হয়ে উঠেছে। এ্যাঁ! কথাটা আমার বুকে একটা কেমন সাড়া জাগিয়েছিল। আমার দেহে সবে পাহাড়ের নদীতে প্রথম আষাঢ়ের হাঁটু-ঢাকা জলের মত জল আসতে শুরু হয়েছে। বুকটা আমার ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—আমাকে দেখে চমকালে যখন তখন ওর মনেও কোন সাড়া বা সাধ জেগেছে। বুঝতে পারিনি। যাচাই করবার সুযোগ হয়নি। তের-চৌদ্দ বছরে গেঁয়ো গ্রামের চালচলন অনুযায়ী চোরা চাউনি চাইতে শিখেছি, ঠোঁটের কোণে মুচকে হাসতে শিখেছি। ভুরুও তখন নাচে, কিন্তু নাচতে সাহস করিনে। হাত ইশারায় ডাকলে ভয় করে হন হন করে পা চালিয়ে চলে যাই। কিন্তু মনটা জুড়ে বুকটা জুড়ে ছিল্‌ছিল্ করে জল বইতে শুরু করেছে। শুকনো বালির চড়া আর জেগে নেই। জলের ওই বহতার মধ্যে কত কথা, কত সাধ যে ভেসে যায়—তা ঠিক আপনারা, মানে পুরুষেরা, বুঝতে পারবেন না। সেকালে চৌদ্দ বছরে মেয়েরা মা হ'ত। যারা আইবুড়ো থাকত—তাদের মন বরের কথা ভাবত—এতো বেশি কথা নয়। সুকুমার জাতে বদ্যি। আমরা

গরীব—আমার দিদি বেরিয়ে একজন বিধর্মীর সঙ্গে চলে যাক—তবুও তাকে কামনা করতে বুক যে কত দুর্-দুর্ করত তা অনুমান করে নিন। এর উপর সে আমাদের টাকা দিয়ে পৈতে আর ধূপকাঠি তৈরির ব্যবসার পত্তন করে দিলে। আমাকে দু'গাছা করে তামার উপর সোনার পাত-মোড়া চুরি তৈরি করিয়ে দিলে। তখন—।

বলতে বলতে থেমে গেল গীতা। মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। একটু পর বললে—এই দেখুন আজও সে-কথা বলতে কেমন যেন কানের পাশ দু'টো গরম হয়ে উঠছে। জিভে আটকাচ্ছে। মনে হত কি জানেন—মনে হত—আজই হয়তো বললে—দুপুর বেলা এসে একটু মাথা টিপে দিয়ে যাবে গীতা? মাথাটা কেমন টিস্ টিস্ করছে কাল থেকে। কিন্তু না। সে ডাকত না, বলত না, আমি যা ভাবতাম। ভারী খারাপ লাগত। মধ্যে মধ্যে কাঁদতে ইচ্ছে করত।

পাড়ার দ্বিজ, পেঁচোকে ভোলেননি নিশ্চয়—ওরা ইশারা করতে শুরু করেছে তখন। ওদের ওপর একেবারে খেপে রণচণ্ডী হয়ে উঠতাম। ইচ্ছে হত কথাগুলো সুকুমারকে বলে আসি। নালিশ করার নাম করে বলে আসি। একদিন তাই গেলাম, বললাম—। সুকুমারদা বললে—; তখন সুকুমারদা বলতাম তো! বললে—তাকাবিনে ওদের দিকে। মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি। আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম। শঙ্করদা, ভারী অভিমান হয়েছিল আমার। ভারী অভিমান! সেই অভিমানে কেঁদেছিলাম। তবে কিসের জন্য, কেন, অভিমান করেছিলাম—তা জানি না। সেদিনও জানতান না। তবে বলেছিলাম—ওরা যদি হাত ধরে টানে? আমার কথা শুনে—সুকুমারদা একটা কাঠের বাঁট পেন্সিল কাটা কামারের বড় ছুরি আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—এটা কাছে রাখ্ বুঝলি। তেমন কিছু করতে চেষ্টা করলে এই ছুরিটা দিয়ে মারবি। দেখাবি ওদের—তোর ছুরি আছে। ছুরিটা যে কতদিন বুকে বয়ে বেড়িয়েছি শঙ্করদা! আপনি তো জানেন। মনে পড়ে?

মনে পড়ল।

সুকুমার সেবার চলে গেলে গীতার মা গীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। ওই দ্বিজ, পাঁচুর ভয়েই এসেছিল। গীতাকে তারা উত্যক্ত করছিল তখন বেশি করে। গীতার মা বলেছিল—গীতা ওদের ভয়ে একটা ছুরি বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

গীতাকে বলেছিলাম—ছুরিটা দেখি!

কাঠের বাঁট কামারের হাতের দেশী ছুরি, ছোরা নয়, তাতে দীপ্তি ছিল না। ভয়ঙ্করত্ব ছিল না, কিন্তু একটা মহিমা তার ছিল—সেই মহিমা সেদিনের সেই শীর্ণকায়া যৌবনপ্রান্তে সদ্য উপনীতা এই আধ-মলিন মেয়েটিকে একটি মহিমার ঐশ্বর্য দিয়েছিল। আমি দ্বিজ, পাঁচুকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। তারা পাষণ্ড, তবু আমার মুখের সামনে তারা এমন অন্যায় নিয়ে কিছু বলতে পারেনি। তবে গোঁ গোঁ করে কিছু বলেছিল। সর্বশেষে 'আর হবে না' বলে চলে গিয়েছিল।

* * *

১৯২৯ সালে পুজোর পর তৃতীয়বার এলো সুকুমারদা। বাড়ী ভাড়া করলে। মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর পড়েছে। বদ্যি বাড়ীর ছেলে, আর এ গ্রামে সকল লোকে ভালবাসে—প্র্যাক্‌টিস করবে এখানে। আসলে এল ১৯৩০ সালে। দেশে একটা কিছু কাণ্ড হবে; তার জন্যে। এখানে থেকে সে কাজ করবে। সেইবারই ও দরজার গায়ে আল্‌কাতরা-মাখা দরজায় ওই ছড়াটা লিখেছিলাম। আমারই লেখা। প্রথমটায় আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি শঙ্করদা।

আমি ভেবেছিলাম। বলতে বলতে থেমে গেল গীতা।

কিছুক্ষণ পর একই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস এবং একটু বিষণ্ণ হেসে বললে—দেখুন, আজও এতকাল পরে আপনার কাছে বলতেও লজ্জা হচ্ছে। কি বলব—মেয়েদের লজ্জাকে। আমি ভেবেছিলাম—সে আমারই জন্যে ফিরে এসেছে। আমার তখন মনে-মনে; কি বলব বুঝতে পারছি না শঙ্করদা। মানে আমার জীবনে তখন সাধ জেগেছে—তৃষ্ণা জেগেছে। সাজতে-গুজতে ইচ্ছে করে, আয়নায়

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখি, একটা ঘরে—পাঁচরকম করে চুল আঁচড়ে দেখি।

পুরুষেরা আমার দিকে তাকালে যত অস্বস্তি লাগে—তত আবার ভালও লাগে। এসব কি বলব বলুন আপনাকে। অনুমান করতে তো পারেন। পুরুষ দেখলেই চোখ নামাই, মনে হয় আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমাকে গিলছে। মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখে নিই। তাই আমার মনে হয়েছিল—সে আমার জন্যেই এসেছে।

তার ওপর এখানে এসে বাড়ী ভাড়া করলে আমাদের বাড়ীর কাছে, আমার ভাইটাকে চাকরি দিলে—বললে, কম্পাউণ্ডারি শিখিয়ে নেব ; আমাদের বাড়ীতে টাকা দিয়ে খাবার ব্যবস্থা করলে ; এসব দেখেশুনে প্রথম দিনই আমার মনে হয়েছিল—ও আমার জন্যে এসেছে !

প্রতিদিন সকালে উঠে ভাবতাম—আজ নিশ্চয় আমাকে ডেকে ও বলবে—গীতা, আমি তোমাকে ভালবাসি। দিনটা যেত, রাত্রে বিছানায় শুতাম, কিন্তু ঘুম আসত না, মধ্যে মধ্যে চমকে উঠতাম, মনে হত—কেউ যেন কোন শব্দ করছে, নয় ?

কান পেতে শুনতাম। বুক ধড়্-ফড়্ ধড়্-ফড়্ করত। কিন্তু কোথায় কি ? ভারী খারাপ লাগত, এক-একদিন কান্না পেয়েছে, সত্যি সত্যি কেঁদেছি।

দিনের বেলা পাঁচ সাতটা ছুতো করে ওর কাছে যেতাম।

চা করে নিয়ে যেতাম। সে বার চার-পাঁচ। তা ছাড়া দু'বার যা একবার—'এ্যাঁ-যাই' বলে অকারণে সাড়া দিয়ে ওর বাসায় গিয়ে উঠতাম—বলতাম—ডাকলেন আমাকে ?

দু-একজন রোগী নিয়েও যেতাম।

একবার দুবার ভাইটা ওখানে থাকত, তাকে মিছিমিছি বকতে যেতাম—আমার এটা পাচ্ছিনে। নিশ্চয় তুই নিয়েছিস। সে বলত—না। খুব খারাপ ছিল তার মুখ, ভারী কর্কশ ছিল তার কণ্ঠস্বর—হাউ হাউ করে উঠত, সুকুমারদা এসে দাঁড়াত, বলত—কি হয়েছে ?

এটা বুঝতে পেরেছিল মা। বলত—ওইখানে ধরণা দিয়েও—ও ডালে গলায় দড়ি দিয়েও ঝোলা যাবে না। মরতে মিছিমিছি পায়ের তলা খোয়াস কেন?

তবে দোষ একলা আমারও ছিল না। সে ইচ্ছে করে এসব বলত কিনা জানি না—তবে বলেছে শঙ্করদা; বলেছে—কাপড় যেমনই হোক মরলা কাপড় পর কেন? কাপড় তো নিজে সাফ করে নিতে পার। ছেঁড়া কাপড় পরিপাটি করে সেলাই করে নিতে পার। ওতে বিশ্রী দেখায়। ভাল লাগে না দেখতে। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ঘামতাম। কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠত। মনে কি হত তা কথায় গেঁথে মানে করা যেত না—তবে বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করত।

একটু থেমে থেকে গীতা বললে—১৯২৮-২৯ সালের কথা তো মনে আছে আপনার, গ্রামের মেয়েরা তখন সেমিজও পরত না, শুধু শাড়ীই ছিল দেশবাস। ঝিউড়ি মেয়েরা বুকের উপর ভাঁজ করে কাপড়ের আঁচলটিকে রেখে পিঠ দিয়ে ঘুরিয়ে আঁট সাঁট করে কোমর বেঁধে পরে বেড়াত—কাঁধ পিঠ—একদিকের পাঁজরা খানিকটা করে খোলাই থাকত; আর সধবা বিধবা যারা সে বউ বেটী—এরা কাপড় ঝলমলে করে মাথায় ঘোমটা টেনে—পিঠে চাবিশুদ্ধ আঁচল ফেলে পরতো; এদেরও হাত দু'খানা পুরোই খোলা থাকত, কাঁধও একটা দেখা যেত। তার সঙ্গে সেইদিকেই পাঁজর এবং পিঠও মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ত। এই দু' চারটে ঘর—যেমন কালীবাবুর বাড়ী—তোমাদের বাড়ী—নারানবাবুর বাড়ী—এই একের বাড়ীর বউ-ঝিয়েরা সেমিজ পরে তার উপর শাড়ী পরতো। আমার কাপড় জোটে না তো সেমিজ! ওই আমাকে সেমিজ পরতে ধরালে। একদিন দুটো সেমিজ দু'জোড়া শাড়ী কিনে এনে বললে—সেমিজ পরে শাড়ী পরবে। বড় হয়েছ তুমি।

আমার সে লজ্জা তার সঙ্গে সে-আশ্চর্য আনন্দের কথা মনে করলে যে কি আনন্দ হয় কি বলব।

এরপরই সে খদ্দরের দোকান খুলে আমাকে দোকানে রাখল।

মাইনে হল মাসে পনের টাকা আর বছরে চারখানা শাড়ী, দুটো সেমিজ, চরটে ব্লাউজ, দুটো সায়া। সেই পরে আমি রাখ হরি বাউরীর মাথার খদ্দরের মোট চাপিয়ে গ্রামের পাশের বাড়ীতে খদ্দর বেচে আসতাম।

www.boiRboi.blogspot.com

নোট বই হল, একটা সস্তা ফাউণ্টেন পেন হল, একটা কপিং পেন্সিল। ক্যাশমেমো কাটতে শিখলাম। এর সঙ্গে সুকুমার বিদ্য খবরের কাগজের এজেন্সী নিয়েছিল—আমার মেজ ভাইটা কাগজ বিলি করত। একখানা কাগজ তার নিজের ছিল—সেটা আমাকে পড়তে হত।

আশ্চর্য, ছ'মাস আটমাস যেতে না যেতে আমি আর এক গীতা হয়ে গেলাম!

আমি সাম্রাজ্যবাদ বুঝলাম, জাতীয়তাবাদ বুঝলাম, স্বাধীনতা বুঝলাম, বিপ্লব বুঝলাম, হিংসা-অহিংসার ভেদ বুঝলাম। সশস্ত্র বিপ্লবের রোমান্স বুঝলাল। শঙ্করদা—এ জেলায় যখন তেত্রিশ-চৌত্রিশ সালে কনস্পিরেসি কেস হয়েছিল—তখন থানায় আমাকে ডেকে ডেকে যে হয়রানি করেছিল তা আপনি জানেন! সুকুমারদা তো জেলে গেল তিরিশ সালে—ছাড়া পেয়ে জেল গেট থেকে নজরবন্দী হয়ে দেউলী জেলে চলে গেল। এখানে কনস্পিরেসি কেস হল—আপনাকেও তাতে টানতে চেষ্টা করেছিল। আমার কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। বলুন তো সে আমি তখন কেমন আমি হয়েছি।

মনে আছে। খুব ভাল করেই মনে আছে।

মনে আছে আমি একবার তুলনা দিয়েছিলাম ইস্পাতের টুকরোর সঙ্গে। বলেছিলাম—এক টুকরো ইস্পাত একজন সৈনিকের হাতে পড়ল—সে সেটা থেকে একখানা অস্ত্র তৈরি করিয়ে নিলে এবং ব্যবহারে ব্যবহারে সে অস্ত্র হয়ে উঠল শাণিত এবং দীপ্তিমান। গীতার তুলনা—তাই দীপ্তিমতী বলব।

* * *

গীতা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে। বললে— তার মনের কথা সে জানে। আমার মনের কথা আমি বলি শঙ্করদা। ওই যেদিন প্রথম খদ্দরের শাড়ী-ব্লাউজ-সায়া পরে রাখহরি বাউরীর মাথায় খদ্দরের জামা-কাপড়-শাড়ীর গাঁট চাপিয়ে আর— আর একজনের মাথায় একটা গ্রামোফোন চাপিয়ে আপনাদের পা.ায় গিয়ে দুর্গা বাড়ীতে নামিয়েছি সেদিন আমার মনে মনে ধারণাই হয়ে গেল যে, ওই আমার বর হবে। আমি যা করছি—এ ওর হুকুমই তামিল করছি না, ওকে পাবার জন্যে তপস্যা করছি। কেমন করে ধারণাটা হল, শুনুন আপনাকে বলি।

খদ্দর বিক্রির জন্যে একটা ফন্দি তৈরী করে নিয়েছিল আপনাদের সুকুমার বদ্যি। কতকগুলো সেকালের স্বদেশী গানের রেকর্ড আর একটা গ্রামোফোন নিয়ে গিয়েছিলাম ওর পরামর্শ মত। প্রথমেই ওই গান বাজিয়ে দিলাম—'বঙ্গ আমার জননী আমার' আর 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'—গান দু'খানা খুব জমাট গান। দুপুরবেলা গান বাজলেই এবাড়ী-ওবাড়ী থেকে ছেলে মেয়ে ছুটে আসত, তার পিছনে পিছনে মায়ের দল।

প্রথম দিনই সরকার বাড়ীর মেয়ে গোপা এসে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলে। এসে বললে কি জানেন? বললে—খদ্দর বেচতে এসে ওসব স্বদেশী গান কেন? গান বন্ধ কর। আর মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক—খদ্দর নিয়ে দেশের নেতা হতে এসেছ কেন?

আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি, খানিকটা হতভম্ব মত হয়ে গিছলাম। মেয়েটা বলে কি? গোপাকে তো চিনি। এই তো বছরখানেক বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়ী থেকে নতুন এসেছ। এমন তো ছিল না!

মাতুপিসী—ওই বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর মাতুপিসী, সেও ছিল—ঠাকুর-বাড়ীতে খেয়ে-দেয়ে দুর্গাঘরের বারান্দায় একটু শুতো সে বারোমাস। সে শুয়েছিল—গান বোধহয় তার ভাল লাগছিল। সে বললে—তা

বাজালে তো কি হল ? বেশ লাগছে। তোর আপত্তি কিসের লা গোপা ?

গোপা বললে—আচ্ছা। তুমি জানো না। এ সব ওরা রাজদ্রোহ প্রচার করছে।

—রাজদ্রোহ ? মাতুপিসি গোপার মুখের দিকে চেয়ে—ওই কথাটি বলেই হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বললে—বুঝেছি-বুঝেছি। তোর বর শুনেছি দারোগার চাকরি পেয়েছে। তুই দারোগা গিন্নী। হ্যাঁ তোকে তো এসব দেখতেই হবে। স্বামীর বলে অর্ধাঙ্গিনী সহধর্মিনী।

তারপর আর এক চোট হাসি। হেসে বললে—আর গীতা তুই বুঝি স্বদেশীওলার বউ হবি! তাই খদ্দর বেচছিস—স্বদেশী গান শুনিয়ে বেড়াচ্ছিস! শিবের জন্যে তপিস্যে করেছিলেন মা দুর্গা—তুইও তাই করছিস ? তা বেশ। এমনি তো জুটবে না কেউ। জুটবে কানা খোঁড়া নয়তো গাঁজাল মাতাল। বড় বোনটা তো বেরিয়ে গেল। তা বেশ। হোক লোকটা বদ্যি-বামুন বরও বেশ, খাসা বর ভাল বর—ছাড়িসনে। একালে জাত নিয়ে ধুয়ে খাবি ?

গোপা একেবারে খেপে গিয়েছিল। তর্ক-তকরার না করেই হুকুম করে বলেছিল—বন্ধ কর গান। ঠাকুরবাড়ীতে আমার বাবার ভাগ আছে। বন্ধ কর।

মাতুপিসীও খেপে গেল। মাতুপিসীর বাবার ভাগ ছিল না ঠাকুরবাড়ীতে। খেপে গেল সেই কারণে। বলে উঠেছিল, ওলো আমার ভাগওয়ালার বেটি ভাগওয়ালী, পেঁচো দারোগার পরিবার পেঁচি দারোগানি···একেই বলে সাপের পাঁচ পা দেখা! ঠাকুর-বাড়ীতে তোর বাবার ভাগ তো তিন পয়সা না দুপয়সা দুগণ্ডা দুকড়া দুকেরান্তি তার আবার এত গরম! উঠে আয় লো গীতা—এসে এই ঠাকুরবাড়ী ঢুকবার দরজার সামনে বস—বসে খুব লাগা—কলের গান। লাগা বন্দেমাতরম্।

গোপা ছাড়েনি, সে বলেছিল—রাস্তায় বসবে কি রকম ?

পাবলিক রাস্তা!

চীৎকার করে উঠেছিল মাতুপিসী।—বেশ করবে, বেশ করবে; বেশ করবে। দারোগার পরিবার দারোগা-বিলাসিনী। "রামগতি দারোগার সোহাগিনী গোপা, ছেঁড়া চুলের গুছি দিয়ে মস্ত বড় খোঁপা, ধপ-ধপিয়ে পুকুর ঘাটে কাপড় কাচে ধোপা, তা ছাড়িয়ে উঠছে শোন গোপার মুখে চোপা।"

শেষ পর্যন্ত মাতুপিসী খিস্তি করেছিল খানিকটা। মাতুপিসীর ছড়ার কথা তো জানেন আপনি। বলতে তো হবে না!

সে কথা এখন থাক! যা হয়েছিল বলি। গোপা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গিয়েছিল—তারপর তার বাপ-মা এসেছিল। ঝগড়া হয়েছিল খানিকটা। জিততে কিন্তু তারা পারেনি। জিতেছিল—মাতুপিসী। আর মাতুপিসীর সঙ্গে হয়েছিল আমার জিত। সেদিন ওই ঠাকুর-বাড়ীর দরজায় কাপড়ের গাঁটরি খুলে—স্বদেশী গান বাজিয়ে—আসর পেতে মাতুপিসী বক্তৃতা জুড়েছিল। বক্তৃতা মানে দারোগার বউ, দারোগার শ্বশুর-শাশুড়ীর কেচ্ছা, তাদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ। লোকে হেসে আকুল হয়েছিল। কাপড়ও বিক্রি হয়েছিল কম না। মনে আছে—একশো টাকার উপড় কাপড় বেচেছিলাম।

এর থেকেই হঠাৎ হল কি জানেন?

হল, হঠাৎ এক সময় মাতুপিসীর মনের মধ্যে কি হল কে জানে বললে—দেখবি—এই যে তোর বিয়ে হবে—এ বিয়ে কত—কত সুখের বিয়ে হবে! এই আমাদের কালে—ছেলে মেয়েতে বিয়ের সম্বন্ধ ছেলেবেলা থেকে হয়ে থাকত। এই চার পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গে এক বছরের মেয়ে। নয়তো সাত বছরের ছেলে চার বছরের মেয়ে। আবার শিবপদদা'র সঙ্গে বিজলী সম্বন্ধ হয়েছিল শিবুর একবছর বিজলীর একুশ দিন বয়সে। তখনকার দিনে ছড়া বাঁধত এই সব বর-কনেকে নিয়ে। "আঁধার রাতে গ্যাসের আলো—! শিবপদকে বিজলীবালা"। বিজলীর কি খুশী আবার কি লজ্জা! শিবপদকে বললে শিবপদ তাড়া করে মারতে আসত। ধীরেনের

সঙ্গে রাধারাণীর, কালিগতির সঙ্গে ইন্দুমতীর বিয়ে সেও সেই ছেলে বয়েস থেকে। আমরা বলতাম—গাড়ুর উপর গামছাখানি—ধীরেন-বাবুর রাধারাণী। কালিগতির ইন্দুমতীর ছড়া ছিল—"কালিগতি ইন্দুমতী—সামাদানে মোমের বাতি"। সে সব কত ছিল রে। শিবপদ ইস্কুলে ফেল হলে বিজলী কাঁদত।

বলেই যাচ্ছিল মাতুপিসী। আমি শুনে যাচ্ছিলাম—ভারী ভাল লাগছিল—শরীর কেমন অবশ হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে কখন যে আমি মনে মনে তাকে আর আমাকে জড়িয়ে ছড়া বেঁধে ফেললাম জানি না। তবে বেঁধে ফেললাম। "সুকু বদ্যির গীতার গুণ—চৈত্রমাসের নিম বেগুন"। ওর মধ্যে ভারী একটু রহস্য আছে। আপনি জানেন কি না জানি না, নিম-বেগুনে তার রুচি ছিল। আমাকে প্রায় বলত—আজ নিম-বেগুন বানাইবা গীতা! হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম এত নিম-বেগুন খান কেন? সে বলেছিল—ভারী মিঠা আর তেমনি গুণ। বুঝলা না?—তাই নিজেকে নিম-বেগুন—মানে তেতো বলতে ভালই লেগেছিল!

ভেবেছিলাম কথাটা বলব তাকে। কিন্তু তা কি বলা যায়? যায় না।

বলতে পারিনি! তবে আমি না বললে কি হবে? সেদিনের সব কথাই তার কানে উঠেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল—আজ কি-যেন হয়েছে গীতা? শুনলাম!

বলেছিলাম—কি শুনছেন?

—কেন দারোগার বউ নাকি—তোমাকে খুব আইন দেখিয়েছে! বলে—সিডিশন প্রচারের জন্যে তোমাকে এ্যারেস্ট করবে?

বলেছিলাম হ্যাঁ। দক্ষিণ পাড়ার গোপা আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে কাটোয়ার কাছে—বরের নাম রামগতি, দারোগাগিরি চাকরি পেয়েছে।

বুকটা লাফাচ্ছিল শঙ্করদা। মাতুপিসীর সেই কথাটা হয় তো এইবার বলবে। বলবে লোকে নাকি রটাচ্ছে—গীতা তুই বুঝি

স্বদেশীওলার বউ হবি ? খদ্দর বেচে তার বউ হবার হাতে খড়ি নিচ্ছিস ? কিন্তু তা সে বললে না।

www.boiRboi.blogspot.com

মনে মনে ভারী দুঃখ হয়েছিল। কোন কিছু নেই মন খারাপ হয়ে গেল। বাকি দিনটা শরীর খারাপ-খারাপ করছিল। রাত্রে ঘুমও ভাল হয়নি। শেষ রাত্রি তখন, শুয়ে থাকতে ভাল লাগেনি। উঠে বসেছিলাম। বাইরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছিলাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে। সেদিনের মত তারা-ভরা নীল আকাশ বোধহয় জীবনে দেখিনি। তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল —ওই লেখা রয়েছে "গাড়ুর উপর গামছাখানি ধীরেনবাবুর রাধারাণী"। তার পাশেই ওই—"কালিগতি ইন্দুমতী সামাদানে মোমের বাতি।" তার পাশে ওই—

দাঁড়িয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ঘাড় ধরছিল, —ব্যথা হচ্ছিল, তাই উঠোন থেকে সরে এসে দাওয়ার উপর বসে খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দেখব ঠিক করলাম।

ওঃ, স্পষ্ট মনে রয়েছে শঙ্করদা। একেবারে কালকের ঘটনার মত স্পষ্ট।—বসলাম তো মনে হতে হল এমন একটা শক্ত এবং ধারালো কোণওয়ালা কিছুর উপর বসলাম যে সেটা বোধহয় মাংস ভেদ করে বসে গেল। সমস্ত শরীর বিশেষ করে মাথা যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। উঃ বলে চীৎকার করে উঠেছিলাম কিন্তু নিস্তব্ধ নিঝুম রাত বলেই রক্ষে, কেউ শুনতে পায়নি। পেয়েছিলাম আমি নিজে। লজ্জাও পেয়েছিলাম আবার রাগও হয়েছিল—ওই যেটা এমন দুঃখ যন্ত্রণা দিল সেটার উপর। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেটা কি ? ভেবেছিলাম লোহার টুকরো কি কোন পাথরের টুকরো কি কাঁচটাচের ভাঙা টুকরো হবে। কিন্তু না। সেটা ছিল একটা খড়ির টুকরো। আমার ছোট ভাইটার রোগ ছিল উঠোনে দেওয়ালে দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকিবুকি কাটা। সেই টুকরো একটা পড়েছিল দাওয়ার উপর আমি তার উপর থপ্‌ করে বসে পড়েছি।

খড়ির টুকরোটা নিয়ে ইচ্ছে হল আছড়ে ফেলে দি'। একবার

ইচ্ছে হল কোন শক্ত একটা কিছু দিয়ে ওটাকে গুঁড়ো করে দি'। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দি'। এরপরই ইচ্ছে হল—না। বেশ হয়েছে এটা পেয়েছি। বোধহয় অদৃষ্ট এটাকে অমনি করে পাইয়ে দিলে। ওই ওকে আমাকে নিয়ে যে ছড়াটা—"সুকু বদ্যির গীতার গুণে—চত্রি মাসের নিম-বেগুনে";—ওই ছড়াটাকে লিখে দেবার জনে পাইয়ে দিলে। যদি সুকু বদ্যির দরজায় লিখে দিয়ে আসি তাহলে কাল সকালেই ওটা ও দেখতে পাবে। তাই লিখবার জন্যেই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরুলাম। সেই খিড়কির পথ দিয়ে বের হলাম—যে পথ দিয়ে দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিছল। বের হয়ে কিন্তু ওর দরজায় যেতে পারলাম না। আমাদের নিজেদের দরজায় লিখে দিয়ে ফিরে এলাম।

পরের দিন গাঁয়ে এ নিয়ে তুমুল হাসাহাসি-কানাকানি হবে ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু শঙ্করদা, তার কিছুই হয়নি। কিন্তু সে এটা বুঝেছিল। সে দেখেছিল, পড়েছিল···আমার হাতের লেখাও বোধহয় চিনেছিল।

এ কথা কেন বলছি জানেন ?

বলছি এই জন্যে যে, ঠিক তার পরের দিন আমার ভাইটা, সুকুমার বদ্যির কম্পাউণ্ডার, সে বাড়ী এসে গাঁয়ের লোককে গাল দিতে ন্যাকড়া আর একটা গেলাসে জল নিয়ে গিয়ে লেখাটা মুছে দিলে। বললে—সুকুমারদা দেখেছে—আমার চোখে পড়েইনি। লোকেদের কাজ দেখ্‌তো ?

শঙ্করদা—তা মুছে দিক কিন্তু আমি এরপর কত জায়গায় যে ছড়া লিখেছি তার ঠিক নেই। আপনি গ্রামে খুঁজলে এখনো পাবেন। পোড়ো মন্দিরের শেওলা-ধরা গায়ে খোদাই করা পাবেন। কোথাও কয়লার লেখা পাবেন। খড়ির দাগ বোধহয় থাকবে না কালো হয়ে গিয়ে থাকবে।

যাকগে শঙ্করদা। আর সেই লজ্জার কথা এক কাহন করব না। করে লাভ নেই। তবে আমার বেশ ভাল লাগছে। খুব ভাল

লাগছে বলতে। এরপর সে জেলে গেল ১৯৩০ সালে। সেখান থেকে গেল দেউলীতে। আমি তার যোগ্য হবার জন্যে পড়লাম, পরীক্ষা দিলাম, পাস করলাম, স্বদেশী করতে গিয়ে দেশ চিনলাম—দেশের সেবা করলাম। আপনি শঙ্করদা—আপনিই কতবার কত মিটিংয়ে বলেছেন—এ মেয়ে আমাদের গ্রামের গৌরব। রবীন্দ্রনাথকে দেখে এলাম, চিনলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখলাম। প্রসেশনে ধ্বজা-পতাকা বইলাম। মনে প্রত্যাশা করে রইলাম—সে একদিন আসবে, আমি এই তপস্যা করছি—তা আমার ব্যর্থ হবে না। তাঁকে একদিন আসতেই হবে, আসতেই হবে, আসতেই হবে।

এলও একদিন।

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট এল। কিন্তু এল তার বউ নিয়ে। সে বিয়ে করেছে। এম-এ পাশ করা, রূপসী মেয়ে। আমাকে জানায়নি।

জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি—এটা সত্য নয়।

সাহস করেনি।

সে জানতো না বলছেন? না। সে জানতো।

১৯৪৭ সালের গভীর রাত্রে সে আমার কাছে এর জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছিল। আমি তাকে বের করে দিয়েছিলাম বাড়ী থেকে। একটা ভাঙা কাঠ ছুঁড়ে মেরেছিলাম—তার ভুরু কেটে গিয়েছিল।

পরের দিনই সে চলে গেল।

আমি প্রথম ভেবেছিলাম বিষ খাব। তারপর ভেবেছিলাম—কেলেঙ্কারি করে বাড়ী থেকে চলে যাব—দিদির পথ ধরব।

তারপর হঠাৎ ওই বউ মরা পণ্ডিতটাকে আক্রোশ ভরে বিয়ে করে ফেললাম।

১৯৪৮ সালে সে আবার এসেছিল। তার তখন বউ মরেছে, তখন এসেছিল আমাকে বিয়ে করবে বলে।

মনে আছে আপনার শঙ্করদা? আপনাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার বাড়ীতে। আপনারা খেতে বসেছিলেন—আমি পরিবেশন করতে করতে বলেছিলাম—ওঃ ভুরুর দাগটা তো অনেকটা

হয়ে থেকে গেছে। সেদিন তাহলে অনেকটা কেটেছিল।

* * * *

হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার।

আমরা দু'জনে গীতার ঘরে গিয়ে বসেছিলাম। দেখছিলাম গীতার সুন্দর সুরুচিপূর্ণ গৃহসজ্জা এবং তার সেদিনের নিজের সাজ-সজ্জা।

অপরূপা মনে হচ্ছিল তাকে।

সেদিন সে সেজেছিল। সব থেকে উজ্জ্বল এবং বড় করে এঁকেছিল কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর সিঁথির সিঁদুরের রেখাটি।

গাঢ় লাল এবং সুদীর্ঘ। একেবারে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত।

আমরা বসতেই গীতা হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েও খুশী হয়নি—বলেছিল—নাঃ শঙ্করদা—এই পায়ে হাত ঠেকিয়ে পেন্নাম এটা যেন সেলাম সেলাম ব্যাপার—বড় জোর কুর্নীশ। দাঁড়ান ভাল করে প্রণাম করি। বলে গড় হয়ে নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমারকে নমস্কার করে বলেছিল—"এখন আমি দীক্ষা নিয়েছি। বামুনের মেয়ে বামুনের বউ। আপনাকে দাদা বলে ডাকি—সে অন্য কথা। তা বলে হেঁট হয়ে বা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারব না।"

মনে পড়ল বই কি।

তবে মানেটা আজ বুঝলাম!

কথা শেষ হলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম দু'জনে। অনেকক্ষণ। কোন কথা যেন কেউই খুঁজে পাইনি আমরা। অনেকক্ষণ পর আমি একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম—

—তা হলে গীতা?—

—শঙ্করদা?

—কি করব!

গীতা ঘাড় নেড়ে বললে—না।

॥ সমাপ্ত ॥

www.boiRboi.blogspot.com